৬.১১ কালো মেঘ – Bangla Library

৬.১১ কালো মেঘ – Bangla Library

৬.১১ কালো মেঘ

কালো মেঘ–৯১

ধীরে ধীরে স্বামীর চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো মনিরা।

এখনও ঘুম ভাঙেনি বনহুরের।

ডাকবাংলোর মুক্ত জানালা দিয়ে এক ঝলক আলো এসে পড়েছে বনহুরের ঘুমন্ত মুখে। অপূর্ব সুন্দর লাগছে বনহুরকে। মনিরা নির্ণিমেশ চোখে তাকিয়ে আছে স্বামীর মুখের দিকে।

শালবন থেকে ভেসে আছে পাখির কলরব।

একটু পূর্বে মনিরা জানালার কপাট খুলে দিয়েছে, রাতে ওটা বন্ধ ছিলো। মনিরা স্বামীকে আজ একান্ত আপন করে পেয়েছে, এমন নিশ্চিন্তে বুঝি আর কোনোদিন সে তাকে পায়নি।

প্রাণভরে মনিরা দেখছে ওকে।

সত্যি মনিরা নিজের ভাগ্যের জন্য গর্ববোধ করে। এমন স্বামী ক'জন নারীর ভাগ্যে জোটে! ওকে জাগাতে ইচ্ছা করে না মনিরার।

এমন সময় বাইরে শোনা যায় ফাগুয়ার গলা–বাবু! ও বাবুজী!

মনিরা ডাক দেয়–ওঠো, ফাগুয়া ডাকছে।

উঁ! হাই তুলে চোখ মেলে বনহুর।

মনিরা হেসে বলে–আরও বুঝি ঘুমাতে ইচ্ছে করছে।

হাঁ, করছে! বনহুর কথাটা বলে মনিরার কোলে মুখ গুঁজে শুয়ে রইলো।

বললো মনিরা–একি, ওঠো।

না। লক্ষীটি, আজ আমাকে ডেকো না।

তোমার পাগুয়া ডাকছে।

ও জানে না তাই.....তুমি ওকে বারণ করে দাও মনিরা।

মনিরা স্বামীর ছেলেমানুষি দেখে হেসে উঠে খিল খিল করে।

বনহুর স্ত্রীকে হাসতে দেখে অবাক কণ্ঠে বলে–হাসছো যে বড়!

বললো মনিরা–হাসবো না, তোমার ছেলেমানুষি দেখে বড় হাসি পাচ্ছে। ফাগুয়া কেন ডাকছে হয়তো তোমার জন্য ফুল এনেছে ও।

হয়তো তাই হবে। যাও মনিরা, দরজা খুলে দাও। ফাগুয়া ভিতরে আসুক।

মনিরা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলো।

বনহুরকে মনিরা যা বলেছিলো তাই সত্য, ফাগুয়া অনেক ফল এনেছে। কক্ষে প্রবেশ করে বললো বাবুজী, তোর জন্য ফল এনেছি।

বনহুর বালিশটা কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে সোজা হয়ে বসলো। চোখ দুটো মেলে ধরলো ফাগুয়ার মুখের দিকে–ফাগুয়া, কি দরকার ছিলো এত সাত–সকালে ফল নিয়ে আসার

বাবু, তুই ফল খেতে ভালবাসিস, তাই আমি খুব ভোরে জঙ্গলে গিয়েছিলাম ফল আনতে। খুব ভাল মিষ্টি ফল বাবু। কথাগুলো বলে কোচড় থেকে ফলগুলো রাখলো বিছানার একপাশে।

বনহুর হাত বাড়িয়ে একটা ফল হাতে তুলে নিয়ে দেখলো, তারপর বললো–ফলগুলো চমৎকার দেখতে, নিশ্চয়ই সুস্বাদু হবে?

হাঁ বাবুজী, খুব ভাল আর খুব মিষ্টি আছে।

মনিরাও ফলগুলো নেড়ে চেড়ে দেখছিলো।

ফাগুয়া বলে এবারবাবুজী, দুপুরবেলা হামার ওখানে খাবি। বৌ আর তুই, বুঝলি বাবুজী? তবে হাঁ, হামরা তোদর মত পাক করতে জানি না। সব হামি জোগাড় করে দিবো, বৌ পাক করবে, কেমন?

বনহুর বললো–চমৎকার, তাই হবে। বলো মনিরা, রাজি?

হাঁ।

সত্যি কতদিন বনভোজন খাই না। বনভোজন হবে, তাই না?

হাঁ গো হাঁ।

হেসে বেরিয়ে যায় ফাগুয়া।

বনহুর মনিরার হাতখানা ধরে টেনে নেয় কাছে। তারপর বলে–অনাবিল শান্তি আর আনন্দ আমি চাই মনিরা–আমাকে তাই দাও......

বলো কি চাও তুমি?

পৃথিবীর কোলাহল আর দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি চাই মনিরা। বড় ক্লান্ত আর অবসন্ন হয়ে পড়েছি। পৃথিবীর দিকে যত গভীরভাবে তাকিয়ে দেখি ততই যেন উদভ্রান্ত হয়ে পড়ি, চারিদিকে শুধু দুর্বলের প্রতি সবলের নিষ্পেষণ...অনাচার... অবিচার...।

এইতো আবার তুমি সেই কোলাহলময় পৃথিবীর দিকে ঝুঁকে পড়ছো? আবার তুমি সেই জমাট অন্ধকারের মধ্যে।

মনিরা, আমি বুঝতে পারি না কেন, কেন আমি তলিয়ে যাই, পৃথিবীর সেই অন্ধকার দিকটার মধ্যে কেন আমি হারিয়ে যাই। কেন আমি নিজকে ধরে রাখতে পারি না আলোর ভিতরে? যে আলো নিয়ে বেঁচে আছে পৃথিবীর মানুষ, আমি কেন সে আলো উপভোগ করতে পারি না? মনিরা, বলো মনিরা, কি করে আমি নিজকে আলোর মধ্যে ধরে রাখতে পারবো।

তুমি তা পারবে না। গম্ভীর কণ্ঠে বললো মনিরা।

বনহুর ব্যাকুল কণ্ঠে বললো–কেন, কেন পারবো না মনিরা

এই তো বললে পৃথিবীর কোলাহল আর দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি চাই, বড় ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছি...কই, পারলে তুমি পৃথিবীর কোলাহল থেকে মুক্ত থাকতে? আবার তুমি তলিয়ে গেলে সেই অন্ধকারময় পৃথিবীর গভীর অতলে। না না, আর আমি তোমাকে ভাবতে দেবো না। অন্তত কিছুদিনের জন্য তুমি ভুলে যাও সবকিছু...ওঠো, চলো, ফাগুয়া ডেকে গেলো দুপুরে আমরা সেখানে যাবো। ওঠো বলছি..মনিরা স্বামীর হাত ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়।

বনহুর হাতমুখ ধুয়ে ফিরে এলে মনিরা তাকে নতুন পোশাকে সাজায়। এ পোশাক মনিরার কাছে চৌধুরী বাড়িতে ছিলো তার সুটকেসে। ঐগুলো মনিরা স্বামীকে পরতে দেয়।

নিজের হাতে স্বামীর চুলগুলো আঁচড়ে দেয় ভাল করে।

তারপর ফাগুয়ার আনা ফলগুলো তুলে দেয় মনিরা বনহুরের মুখে। নিজেও মনিরা খেয়ে নেয় ফাঁকে ফাঁকে, তারপর বেরিয়ে আসে বাংলো থেকে।

সুন্দর দৃশ্যগুলো উপভোগ করতে করতে এগুতে থাকে ওরা দু'জন। বড় বড় শালগাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে এক একটা দৈত্যরাজের মত। মাঝে মাঝে টিলা আর আগাছা। কোথাও ঝর্ণার উৎস বয়ে চলেছে।

ঝর্ণার পানিতে বুনো হাঁসগুলো মনের আনন্দে সাঁতার কাটছিলো। ঝির ঝির করে বয়ে চলেছে ছোট ছোট ঢেউগুলো পাথর খন্ডের পাশ কেটে। সূর্যের সোনালি আলোতে ঝলমল করছে রূপালি পানির স্রোত। অপূর্ব সে দৃশ্য!

বনহুর ঝর্ণার পাশে স্থির হয়ে দাঁড়ায়।

মনিরা বলে–কি সুন্দর, তাইনা?

হাঁ, সত্যি বড় মনোরম!

এমন করে কোনোদিন প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছো তুমি?

সে কথা সত্যি মনিরা। এমন করে স্থির নিশ্চিন্ত মনে কোনো সময় কোথাও কাটাতে পারি নি, তাই হয়তো এমন দৃশ্য উপভোগ করার সুযোগ আসেনি আমার ভাগ্যে।

এমন সময় ফাগুয়া এসে দাঁড়ায় তাদের পিছনে। হাতে হাত রগড়ে বলে–বাবুজী, তোরা এখানে আর আমি তোদের খুঁজি ফিরছি। বৌরাণী নিজের হাতে রান্না করবে তারপর তো খাবি। চোখের উপর হাত রেখে সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখে নেয় ফাওয়া।

বনহুর হেসে বলে–হাঁ, ঠিক বলেছো, বৌরাণী রান্না করবে তারপর তো খাবো আমরা। চলো ফাগুয়া, তাড়াতাড়ি চলল। এসো মনিরা।

চলো।

বনহুর আর মনিরা পা বাড়ায়।

ফাগুয়া পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে।

শালবনে ঘেরা একটা সাঁওতাল পল্লী। ছন–পাতায় ছাওয়া ছোট্ট ছোট্ট ঘরগুলো ঠিক যেন ছবির মত লাগছে।

ওদিকে ফাগুয়ার ঘর।

পাশাপাশি দুটো ঘরে থাকে ওরা। ফাগুয়া আর ফাগুয়ার স্ত্রী আর মেয়ে রেশমা। ফাগুয়া সারাটা দিন বনে বনে কাঠ কাটে, তারপর শহরে গিয়ে সেই কাঠ বিক্রি করে চাল ডাল তরকারি নিয়ে আসে। তবে ওরা জংলী, শিকার করা ওদের নেশা–বেশির ভাগ সময় ওরা শিকার করে কাটায় এবং সেই শিকারের মাংস আগুনে পুড়িয়ে খায়।

ফাগুয়া বাজার থেকে মস্তবড় মাছ এনেছে। দুধ এনেছে, কলা এনেছে, আর এনেছে তেল লবণ মশলা–যা রান্না করতে প্রয়োজন হয়।

অবশ্য ফাগুয়া জানতো না কিছু।

রেশমা বাপকে বলে দিয়েছিলো কি কি আনতে হবে। রেশমাও জানতো না প্রথম প্রথম তবে সে একবার ডাকবাংলায় এক বাবুর্চিকে রান্না করতে দেখেছিলো। কেমন করে সেই বাবুর্চি রান্না করে তা দেখেও নিয়েছিলো সে মনোযোগ সহকারে। বাবুজি খাবে তাদের বাড়িতে তাই সে বাপকে বাজার থেকে ঐ সব জিনিস আনার জন্য একটি একটি করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলো ভালভাবে।

মনিরা তো অবাক হলো রান্নায় হাত দিয়ে। জঙলী ফাগুয়া সভ্য মানুষের খাদ্যোপযোগী সব জোগাড় করে এনেছে। হাড়ি পাতিল, মাছ তরকারি তেল লবণ, মশলা কিছু বাদ যায় নি।

মনিরা যখন রান্নায় বসলো বনহুর এলো তাকে সাহায্য করতে।

ফাগুয়া বললো–বাবুজি, তুই যা, হামি আর আমার বৌ বৌ–রাণীকে সাহায্য করবে। তাছাড়া হামার বেটি রেশমা আছে...

মনিরা বললো–আচ্ছা ফাগুয়া, এসব কে তোমাকে জোগাড় করে দিয়েছে। এ যে দেখছি রান্নার সবকিছুই সংগ্রহ করেছো তুমি?

বৌরাণী, এসব রেশমার কাজ, ঐ তো আমাকে সব বলে দিয়েছিলো কি কি বাজার থেকে আনতে হবে। হামরা তো শুধু সেদ্ধ আর আগুনে পুড়ে খাই...

তাই নাকি, এসব তোমার মেয়ে রেশমার কাজ? কই, তোমার মেয়ে রেশমা কই তাকে তো দেখছিনা।

ফাগুয়া কিছু বলার আগে বলে উঠে ফাগুয়ার বৌ–রেশমা বড় শরম করে, তাই আসেনি তোদের কাছে। বাবুজি আছে কিনা, তাই...

বনহুর মৃদু হাসে।

মনিরা বলে–দেখেছো, জংলী হলেও ওরা লজ্জাহীন নয়। তাদেরও শরম আছে। তারপর ফাগুয়ার দিকে তাকিয়ে বলে মনিরা–ফাগুয়া, তুমি বুড়ো মানুষ, তোমার বৌ ও বুড়ো, কাজেই তোমরা আরাম করোগে, বরং তোমার মেয়ে রেশমাকে পাঠিয়ে দাও, সে আমাকে সাহায্য করবে।

ফাগুয়া উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেলো ওপাশের ঘরটার দিকে। ডাকলো সে–রেশমা–মাইয়া রেশমা আয়, বৌরাণী তোক ডাকছে।

এবার রেশমা বেরিয়ে এলো।

অবাক হলো মনিরা রেশমার গায়ের রং হলুদ বর্ণ, মাথার চুল কালো আর লম্বা, চুলগুলো ছড়িয়ে আছে সারাপিঠে। একখানা খাটো শাড়ি পরেছে সে–হাঁটু অবধি উঁচু করে।

দেহের গঠন অপূর্ব বলা যায়।

রেশমা লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালো।

মনিরা বললো–চমৎকার মেয়ে তো তোমার ফাগুয়া। তারপর বনহুরের দিকে তাকিয়ে বলে সত্যি, ফাগুয়ার মেয়ে রেশমা ভারী সুন্দর, তাই না?

বনহুর বলে–হা সুন্দর বটে। তাছাড়া ওর বুদ্ধিও কম নয়, কি বলল তোমার রান্নার সবকিছুই সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছে ও।

সত্যি! বললো মনিরা।

রেশমা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলো।

বললো মনিরা–এসো রেশমা, আমাকে তুমি রান্নায় সাহায্য করবে।

রেশমা মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালো।

ফাগুয়া, রেশমা আর ওদের মা মিলে সবাই সাহায্য করলো মনিরাকে। এমন কি বনহুরও সহায়তা করলো আজ মনিরার রান্নার ব্যাপারে। সবাই হাসিখুশি আর আনন্দে মেতে উঠলো।

রান্না শেষ হলে সবাই মিলে খেতে বসলো শালপাতা বিছিয়ে।

ঠিক যেমন বনভোজন হয় তেমনি।

মনিরা আজ উচ্ছল আনন্দে আত্নহারা, স্বামীকে এমন পরিবেশে পায়নি সে কোনোদিন। এ যেন তার পরম লগন, পরম দিন।

খাওয়া শেষ হলে ফাগুয়া ওদের সঙ্গে করে শালবন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে লাগলো। নানা ধরনের জীবজন্তু নজরে পড়তে লাগলো বনহুর আর মনিরার। বিশেষ করে মনিরা অবাক হলো এসব দেখে, কারণ সে তো এমন সব জীবজন্তুর পূর্বে দেখেনি।

কত রকম পাখি।

কত রকম কণ্ঠস্বর, সুমধুর তাদের গানের সুর। মুগ্ধ হয়ে যায় ওরা।

সঙ্গে ফাগুয়া আর রেশমা।

রেশমাকে অবশ্য মনিরাই সঙ্গে নিয়েছে, ওকে নাকি খুব ভাল লেগেছে মনিরার চঞ্চল হরিণীর মত রেশমার চোখ দুটো, কিন্তু রেশমা চঞ্চল নয়–শান্ত স্নিগ্ধ মেয়েটা।

চলতে চলতে অনেক দূর এসে পড়লো বনহুর, মনিরা ফাগুয়া আর রেশমা। বেশ উঁচু একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালো ওরা। সেই জায়গা থেকে বহুদূরে গাঁ নজরে পড়ে। চারদিকে সবুজ ক্ষেত, যেন সবুজের আলপনা।

ফাগুয়া বলে–বাবুজী, ওখানে হামার জমিন আছে, আমিও আবাদ করি।

তাই নাকি? বললো বনহুর।

ফাগুয়া বলে–হামার বৌ আর বেটি রেশমা আমাকে সাহায্য করে। ওরা খুব ভাল, জানিস বাবুজী?

ভাল বলেই তো ওরা তোমাকে তোমার কাজে সাহায্য করে। তাছাড়া রেশমা তোমার গুণবতী মেয়ে......বলে বনহুর রেশমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসে।

ফাগুয়া বলে–বাবুজী, কাঠ নিয়ে শহরে যাবো.......তোরা এখানে থাক, হামি যাই.......

যাও ফাওয়া।

ফাগুয়া রেশমাকে লক্ষ্য করে বললো–রেশমা, বাবুজী আর বৌরাণীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাস, বুঝলি?

মাথা দুলিয়ে জানালো রেশমা—আচ্ছা।

ফাগুয়া চলে গেলো।

রেশমা আর মনিরা রইলো বনহুরের পাশে।

*

এক সময় ওরা ফিরে আসে ডাকবাংলোয়।

হাসি গান আর উচ্ছলতায় মনিরা ভরে উঠে। বলে মনিরা–তোমাকে আর আমি কোথাও যেতে দেবো না। এমনি করে ধরে রাখবো চিরদিন।

সত্যি পারবে?

পারবো।

তাহলে আমি পরম নিশ্চিন্ত হবে।

লুকিয়ে পালিয়ে যাবে না তো?

হেসে উঠলো বনহু, তারপর হাসি থামিয়ে বললো–এত ভয় তোমার আমাকে নিয়ে?

তুমি যে আমার অমূল্য রত্ন।

বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নিয়ে বলে উঠে–আর তুমি!

আমি তোমার জীবনের শত্রু…

ছিঃ ওসব কি বলছো তুমি?

সত্যি! মাঝে মাঝে মনে হয় আমি তোমার পথের কাটা…

মনিরা, তুমি নিজকে কেন এত নগণ্য মনে করো বলো তো? তুমি কি জানোনা আমার জীবনের পরম সম্পদ তুমি। মনিরা, একটা কথা আজও তোমাকে বলবো করে বলা হয় নি কিন্তু বলা নিতান্ত প্রয়োজন…

থাক সে কথা শুনবো পরে–যা বলা হয় নি তা না বলাই শ্রেয়।

কিন্তু

কোনো কিন্তু নয়।

মনিরা, আমি কি বলতে চাই তোমার শোনা দরকার।

জানি দরকার কিন্তু এখন নয়।

মনিরা!

এসো শালবনে যাই।

এইতো কিছুক্ষণ হলো শালবন থেকে এলাম। সত্যি বড় ভাল মানুষ ফাগুয়া আর ওর বৌ, তাইনা?

হাঁ। রেশমাও বেশ ভাল।

ভদ্রঘরের মেয়ে ভাল হবে না?

অবাক কণ্ঠে বলে মনিরা–রেশমা ভদ্রঘরের মেয়ে, বলো কি?

হাঁ মনিরা, রেশমা আসলে ফাগুয়ার মেয়ে নয়।

তুমি কেমন করে জানলে?

ফাগুয়া না বললেও ওর বৌ বলছিলো।

কি বলেছিলো আর কখনই বা বললো?

প্রথম যেদিন আমি এসেছিলাম। তোমাকে নিয়ে কিছুদিন কোনো নির্জন স্থানে কাটাবো বলে ভাল একটা জায়গার সন্ধান করছিলাম। পেয়ে গেলাম এই জায়গাটা। খুব ভাল লাগলো আমার। পরিচয় হলো ফাগুয়ার সঙ্গে। ফাগুয়া আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করলো, আমার সঙ্গে ওর বৌয়ের পরিচয় করিয়ে দিলো। বৌ আমাকে খুব আদরযত্ন করলো, ফলমূল এবং দুধ খেতে দিলো। তখন আমি দেখলাম রেশমাকে। অবশ্য রেশমাই আমাকে দুধের গেলাস এনে দিলো, আমার হাতে। আমি ওকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম যেমন আজ তুমি হয়েছিলে।

হাঁ, আমি রেশমাকে দেখে অবাক হয়েছি, কারণ অমন চেহারার মেয়ে বা ছেলে সাধারণত দ্রসমাজেই দেখা যায়।

আমিও অবাক হয়েছিলাম এবং ফাগুয়ার বৌ সে কারণেই আমাকে বলেছিলো, বাবু, তুই অবাক হয়েছিস আমার রেশমাকে দেখে, তাই না? ও হামার

বেটি না, ওকে হামরা শহরে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। তারপর থেকে হামাদের কাছে থাকে। তাই ও জানে সে হামার মেয়ে।

বল কি! বলেছিলাম আমি…।

ফাগুয়ার বৌ বলেছিলো, হাঁ বাবুজী, রেশমা হামাদের বেটি না হলেও সে জানে হামরা তার বাপ আর মা। বড় ভাল মেয়ে রেশমা।

বললো মনিরা সত্যিই ভালমেয়ে সে, ঠিক যেন ঘরের সন্তান।

যখন রেশমাকে নিয়ে আলোচনা চলেছে তখন রেশমা স্বয়ং এসে হাজির। ওর হাতে একটা ঝাঁকাভর্তি ফুল আর ফল।

এসে দাঁড়ালো সে মাথা নিচু করে।

বললো মনিরা–দেখি কি এনেছ?

বাপু ফল দিয়েছে তোদর জন্য, এই নে খাবি তোরা।

মনিরা ফল আর ফুলের ঝকটা হাতে নেয়, তারপর হেসে বলে–ফল তোমার বাপু দিয়েছে। ফুল দিয়েছে কে?

ফুল হামি এনেছি বৌরাণী।

বাঃ চমৎকার ফুলগুলো! বললো বনহুর।

মনিরা ঝাঁকা থেকে একটা সুন্দর ফুল তুলে নিয়ে স্বামীর দিকে এগিয়ে ধরলো–নাও।

বনহুর ফুলটা হাতে নিলো, তারপর নাকে শুঁকে বললো সুন্দর গন্ধ কিন্তু……

রেশমা তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

মনিরাও অপর একটা ফুল তুলে নিয়ে নাকে ধরলো।

বললো রেশমা–যাই এবার বৌরাণী।

বসো রেশমা, গল্প করি! বললো মনিরা।

রেশমা পূর্বের মত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুরও বললো–রেশমা, তোমাদের বৌরাণী বলছে, বসো।

রেশমা এবার একটা পাথরখন্ডে বসে পড়লো।

বনহুর আর মনিরা বসেছিলো দু'জন দুটি পাথরখন্ডের উপরে। এবার একটি ফল তুলে নিয়ে বনহুরকে দিয়ে বললো মনিরা–খাও।

বনহুর ফলটা হাতে নিয়ে বললো–শুধু আমিই খাবো, তোমরাও খাও।

হাঁ, আমরাও খাবো। রেশমা, তুমিও নাও, আমরা সবাই মিলে খাই, কেমন? কথাগুলো বলে মনিরা আঁকাটা এগিয়ে ধরলো রেশমার দিকে।

রেশমা বললো–বৌরাণী, হামি অনেক ফল খেয়েছি, এবার তোরা খেয়ে নে।

মনিরা তবু ছাড়লো না–সে একটা ফল তুলে নিয়ে রেশমার হাতে গুঁজে দিলো।

রেশমা লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে পড়লো যেন। তবু খেতে হলো ওকে।

বৌরাণী আর বাবুজীর সঙ্গে ধীরে ধীরে রেশমার ভাব জমে উঠলো।

সময় অসময় রেশমা আসতে লাগলো বাংলোয় মনিরার কাছে।

মনিরা ওকে আদর করতে ছোট বোনের মত।

রেশমাও মনিরাকে শ্রদ্ধা করতে শিখলো, শিখলো ভালবাসতে।

পূর্ণিমা রাতে সাঁওতালদের বড় উৎসব।

এ দিন বনহুর আর মনিরাকে আমন্ত্রণ জানালো ফাগুয়া। লাতপাতা আর ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে সাঁওতাল পল্লী। প্রতি পূর্ণিমায় ওরা উৎসব করে। আসে এ গ্রাম সে গ্রাম থেকে বহু সাঁওতাল নারী পুরুষ যুবক বৃদ্ধ অনেকে।

উৎসবের শেষে নানা রকম জীবজন্তু হত্যা করে খায় সাঁওতালরা।

বাবুজী আর বৌরাণীর জন্য রেশমা নিজে খাবার তৈরি করেছে যত্ন সহকারে। নানা রকম পিঠা আর পায়েস তৈরি করেছে সে। বেশ কিছুদিন রেশমা বৌরাণীর কাছে অনেক কিছু রান্নাবান্না শিখে নিয়েছে। এমন কি পিঠা পায়েস এসব তৈরি করাও শিখেছে রেশমা।

রেশমা তার বাপুকে দিয়ে বাজার থেকে দুধ, গুড়, চিনি আনিয়েছে এবং এসব দিয়ে বাবু আর বৌরাণীর জন্য সুন্দর মিষ্টি তৈরি করেছে।

উৎসবে অনেক কিছু খেলাধূলো হলো।

সাঁওতাল যুবকরা ছোরা খেলা, লাঠিখেলা দেখালো, এমনকি মুক্তি লড়াই পর্যন্ত চললো উৎসবে।

উৎসবের একপাশে মঞ্চ তৈরি করেছিলো বাবু আর বৌরাণীর জন্য। বাবু আর বৌরাণী বসেছিলো ঠিক জায়গায় তাদের চারপাশ ঘিরে ফুলের ঝাড় আড় লতাপাতা।

সুন্দর এ মঞ্চটা।

ফাগুয়া তার ক'জন সঙ্গীদের নিয়ে এ মঞ্চ তৈরি করেছে। বনহুর আর মনিরা যখন উৎসবে এলো তখন তারা নিজের বসবার জায়গাটা দেখে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

ফাগুয়া আর ফাগুয়ার বৌ অভ্যর্থনা জানিয়ে ওদের বসালো, তারপর শুরু হলো নানারকম খেলাধুলা আর লড়াই।

সব শেষে নাচ হবে।

মঞ্চের কাছাকাছি ফাঁকা জায়গাটায় নাচবে।

কিন্তু কে নাচবে তখনও জানে না কেউ।

একপাশে মাদল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একদল সাঁওতাল বাদক। তারা প্রতীক্ষা করছে কখন নাচনেওয়ালী আসবে।

বনহুর আর মনিরাকে যে মঞ্চের উপরে বসতে দেওয়া হয়েছিলো তারই ওপাশে বসতে দেওয়া হয়েছিলো ঐ গ্রামের সাঁওতাল সর্দার হরিহরকে।

বিরাট চেহারা, চোখেমুখে দুষ্টোমির ছাপ পরিলক্ষিত হয়। সর্দার বলে ফাগুয়া সম্মান করে কিন্তু তার প্রতি শ্রদ্ধা নেই সাঁওতাল পল্লীর কারো।

লোকটা মোটেই ভাল নয়, অত্যন্ত লোভী এবং অসৎ চরিত্র।

ফাগুয়ার ইচ্ছা ছিলো না হরিহরকে আমন্ত্রণ জানায় কিন্তু না জানিয়ে উপায় ছিলো না, কারণ সে সাঁওতাল পল্লীর শুধু সর্দার নয়, সমগ্র শালগাঁও এর সর্দার সে।

তাই ফাগুয়া হরিহরকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাওয়াৎ করেছিলো পূর্ণিমা উৎসবে। ফাগুয়া হরিহরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ভিতরে ভিতরে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো, কারণ রেশমাকে নিয়ে ছিলো তার চিন্তা। এতদিন রেশমা ছোট্টটি ছিলো, তাই ওকে নিয়ে কিছু ভাবেনি ফাগুয়া, আজ ফাগুয়ার অনেক ভাবনা রেশমাকে নিয়ে।

অবশ্য কারণ ছিলো, হরিহর সাঁওতাল পল্লীর কোন সুস্থ সবল যোয়ান মেয়ে দেখলে তাকে কিংবা তার বাপকে ডেকে পাঠাতো এবং সেই যোয়ান মেয়েটিকে চাই বলে জানাতো। যদি কোনো বাপ বা তার মেয়ে আপত্তি জানাতে তাহলে তার পরিত্রাণ ছিলো না। তাকে ধরে এনে হাত-পা বেঁধে চালাতো সে নির্যাতন। বাপকে বন্দী করে মারধোর করতো আর মেয়েকে নিয়ে চালাতো আমোদ ফুর্তি।

কেউ তাকে এ কাজে বাধা দিতে পারতো না। আর পারবেই বা কি করে। সাঁওতাল পল্লীর একচ্ছত্র অধিপতি হলো হরিহর। তার কথায় সবাই উঠতে বসতো, এমনকি বহু স্বামী তার সুন্দরী বৌকে ওর হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে।

তবে ফাগুয়ার গ্রাম ছিলো দূরে, তাই হরিহর এ গ্রামে বেশি আসা যাওয়া করতো না। এ গ্রামের সর্দার হলো ফাওয়া।

ফাগুয়া বড় ভাল মানুষ। অন্যায়কে সে ঘৃণা করে। প্রতিবেশীর মঙ্গল চিন্তাই তার কাছে সবচেয়ে বড়। কিসে গ্রামবাসীরা ভাল থাকবে বা ভালভাবে চলাফেরা করতে পারে এই নিয়ে ফাগুয়া ভাবতো।

ছেলেমেয়ে তার ছিলো না।

হঠাৎ রেশমাকে ছোট্ট ফুলের মত একটুখানি মেয়ে কুড়িয়ে পেয়েছিলো শহর থেকে ফেরার পথে। সেদিন সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় ফাগুয়া মেয়েটাকে নিয়ে কোথাও কোন খোঁজখবর করতে পারেনি, তাই নিয়ে এসেছিলো কাঁধে করে।

তবে পরদিন আবার সে রেশমাকে নিয়েছিলো শহরে। যাকে সামনে পেয়েছিলো তাকেই সে জিজ্ঞাসা করেছিলো মেয়েটাকে তারা চেনে কিনা।

কিন্তু কেউ মেয়েটাকে চেনে না বলেই জানিয়ে ছিলো। গোটা দিনটা ফাগুয়া সেদিন রেশমাকে কাঁধে নিয়ে ঘুরেছিলো পথে পথে, তারপর সন্ধ্যায় আবার সে পা বাড়িয়েছিলো বাড়ির পথে।

রাতে যখন সে সাঁওতাল পল্লীতে গিয়ে হাজির হয়েছিলো তখন রেশমা তারই কাঁধে ঘুমিয়ে পড়েছিলো অঘোরে রাত তখন কত হবে জানা ছিলো না ফাগুয়ার, তবু আন্দাজ রাত বারোটা একটা হবে।

ফাগুয়ার বৌ রেশমাকে বুকে নিয়ে উজ্জ্বল আনন্দে মেতে উঠেছিলো, ভেবেছিলো যা হোক মেয়েটাকে সে এবার নিজের করে পেলো। তারপর থেকে ওকে তারা নিজের মেয়ে বানিয়ে নিয়েছিলো। নাম দিয়েছিলো ফাগুয়া বৌ নিজে– রেশমা।

প্রথম প্রথম কাঁদতে রেশমা, যদিও ওসে কোনো কথা বলতে পারতো না শুধু নীরবে কাঁদতো। ফাগুয়া আর ফাগুয়ার বৌ ওকে আদর করতো, স্নেহ করতো, করতো যত্ন। ধীরে ধীরে রেশমা ফাগুয়া আর ফাগুয়ার বৌকে নিজের জন মনে করে নেয় এবং কাদাকাটাও বন্ধ হয়ে যায় তার।

সারাদিন শালবনে খেলা করে আর ক্ষুধা পেলে ছুটে আসে ফাগুয়ার বৌয়ের কাছে; নয় ফাগুয়ার কোলে।

এমনি করে দিন যায়।

বড় হয় রেশমা।

ফুলের মত ফুটফুটে আর জোছনার আলোর মত স্নিগ্ধ ছিলো ওর চেহরাটা।

সাঁওতাল বালিকাদের সঙ্গে যখন খেলা করতো–তখন তাকে অপূর্ব লাগতো ওদের মধ্যে।

ফাগুয়া আর বৌ তার দিকে তাকিয়ে আনন্দে আত্মহারা হতো, সত্যি তাদের ভাগ্য না হলে এমন মেয়ে তাদের ভাগ্যে জুটে যায়!

গত বছরই রেশমা অনেক ছোট ছিলো।

বছরের পূর্ণিমায় নাচতে পারেনি রেশমা। এবার সে নাচবে।

হরিহর বসেছে, তার দু'পাশে বসেছে দু'জন বলিষ্ঠ জোয়ান লোক। চেহারাও হরিহরের মত বলিষ্ঠ। তাদের চেহারা দেখলেই মনে হয় ওরা মন্দ লোক, অসৎ তাতে কোনো ভুল নেই।

ফাগুয়া যখন বনহুর আর মনিরাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বসাচ্ছিলো তখন হরিহর তার আসন থেকে লক্ষ্য করছিলো এবং মনে মনে ঈর্ষান্বিত হচ্ছিলো সে। কে ওরা আর ফাগুয়া কেনইবা ওদের এত আদর যত্ন করছে।

এমন সময় রেশমা ফুলে ফুলে ফুলরাণী সেজে মঞ্চের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

হরিহরের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো চকচক করে।

ফাগুয়া ভয় করেছিলো তাই সে তাকিয়ে ছিলো সাঁওতাল সর্দার হরিহরের দিকে। রেশমাকে লক্ষ্য করে হরিহরের মুখোভাব দেখে ভীতি আতঙ্কিত হলো সে।

রেশমার কিন্তু কোনো দিকে খেয়াল নেই।

সে বছরের পূর্ণিমা উৎসবে নাচবে, তার নাচ যেন সবাইকে মুগ্ধ করে তাই সে ভাবছিলো। বিশেষ করে বাবুজী আর বৌরাণীকে নাচ দেখাবে, রেশমার মনে তাই আজ অফুরন্ত আনন্দ।

রেশমা নাচের আসরে এসে দাঁড়াতেই বাদকগণ যারা এতক্ষণ মাদল নিয়ে অপেক্ষা করছিলো তারা মাদল বাজাতে শুরু করে।

রেশমা নাচতে আরম্ভ করে।

অপূর্ব সে নাচ!

সবাই হাততালি দিয়ে আনন্দধ্বনি করে উঠলো।

রেশমা নেচে চলেছে।

হরিহরের চোখের তারা দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। রেশমার যৌবন ঢল ঢল চেহারাখানা শয়তান হরিহরকে আকৃষ্ট করলো। সে ইংগিত করলো পাশে উপবিষ্ট তার অনুচর দু'জনকে।

তারাও চোখের ইংগিতে কিছু জানালো।

হরিহরের মনোভাব ফাগুয়া লক্ষ্য করছিলো এবং সে মনে মনে এক ভয়ঙ্কর বিপদ অবস্থার জন্য তৈরি হচ্ছিলো। হরিহরের চরিত্রের সঙ্গে ফাগুয়ার পরিচয় ছিলো। অনেকদিন নয় ক'মাস আগের ঘটনা ভেসে উঠে ফাগুয়ার দৃষ্টিতে। ওপাড়ার বেনী সাওতালের বৌকে দেখেছিলো হরিহর বাজার থেকে ফেরার

কাঠ বিক্রি করে ফিরছিলো বেনীর বৌ।

সেই পথে যাচ্ছিলো হরিহর, বেনীর বৌকে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো এবং বলেছিলো এটা কার বৌরে?

পাশেই ছিলো তার সঙ্গী দেওনাথ, সে বলেছিলো–বেনী সাওতালের বৌ।

সেই রাতেই বেনীকে হরিহর ডেকে পাঠায় এবং তাকে তার বৌকে নিয়ে যাবার জন্য বলে। বেনী রাজি না হওয়ায় তাকে বেঁধে রেখে চাবুক মারা হয়। এমন কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়েছিলো যার জন্য বেনী ক'দিন পর মৃত্যুবরণ করে। তবু বেনীর বৌ রেহাই পায় না, তাকে হরিহর ধরে নিয়ে যায় এবং তার উপর চালায় সে অকথ্য আচরণ…কথাটা শরণ হতেই ফাগুয়া শিউরে উঠলো। ভাবলো, কেন সে হরিহর সর্দারকে দাওয়াত করেছিলো। না করেও যে উপায় ছিলো না। কারণ তাদের সাঁওতাল পাড়ার সর্দার যে হরিহর, তাকে আমন্ত্রণ না জানালে তাকে চরম শাস্তি পেতে হতো–তাকে একঘরে করতে সর্দার, তখন প্রতিবেশীরা কেউ তাকে সমাজে স্থান দিতো না–তাকে বনে কাঠ কাটতে দিবে না, জলায় মাছ মারতে দেবে না, এমন কি যদি সে মরেও যায় তবু কেউ তার সৎকার করবে না। একঘরে করা হলে সাঁওতাল সমাজে তার কোনো স্থান নেই।

ফাগুয়া তাই এত জেনেও সর্দার হরিহরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলো, না জানিয়ে তার কোনো নিস্তার ছিলো না।

এখন সে বুঝতে পারছে রেশমা হরিহরের নজরে পড়েছে, তার রক্ষা নেই।

ফাগুয়া যেমন হরিহরকে লক্ষ্য করেছিলো তেমনি তাকে আর একজন লক্ষ্য করছিলো সে হলো স্বয়ং দস্যু বনহুর। বনহুর অন্যান্য দর্শকের সাথে যদিও রেশমার নাচ উপভোগ করছিলো কিন্তু তার সজাগ দৃষ্টি ছিলো হরিহরের উপর।

হরিহর যখন রেশমাকে নিয়ে পাশের অনুচরদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে ইংগিত করেছিলো তখন বনহুরের দৃষ্টি এড়ায় না। সব সে লক্ষ্য করে এবং বুঝতে পারে হরিহরের মনোব।

এক সময় উৎসব শেষ হয়।

ফাগুয়া তাদের স্বজাতিদের জন্য যে খাবারের আয়োজন করেছিলো তা তাদের খেতে দেয়। রেশমা খেতে দেয় বাবুজী আর বৌরাণীকে।

হরিহর সেটাও লক্ষ্য করে এবং হিংসায় জ্বলে উঠে সে।

অনেক রাতে যখন সবাই বাড়ি ফিরে যায় তখন হরিহর বলে যায়–ফাগুয়া, কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করবি।

কথাটা শুনে হৃদকম্প শুরু হয় ফাগুয়ার, সে বুঝতে পারে কেন তাকে ডাকা হয়েছে। সমস্ত রাত ফাগুয়া ঘুমাতে পারে না, শুধু এ পাশ ও পাশ করে কাটায়।

বৌ আর রেশমা পাশের ঘরে শোয়, তাই ফাগুয়ার ঘুম না হলেও কেউ বুঝতে পারলো না যে ফাগুয়া সারাটা রাত অনিদ্রায় কাটিয়েছে।

সকাল বেলা তাকে যেতে হবে ও পাড়ায়।

ভোরে উঠলো ফাগুয়া।

কাল রাতে তার বাড়িতে পূর্ণিমা উৎসব উদযাপিত হয়ে গেছে সমস্ত উঠান ছড়িয়ে আছে লতাপাতা আর ফুলের পাপড়ী। একদিকে শালপাতার স্তূপ, ফাগুয়া

যাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো তাদের সবাইকে খাইয়েছে পেট পুরে। পূর্ণিমা উৎসবের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে ফাগুয়ার বাড়ির উঠানের চারপাশে।

ভোরে উঠে বসে বসে ঝিমুয় ফাগুয়া কিছুক্ষণ।

একটু পরই তাকে যেতে হবে হরিহরের নিকটে। না জানি সে কি বলবে। যদিও ফাগুয়া অনুমানে সব বুঝে নিয়েছিলো তবু মনে হচ্ছিলো হয়তো বা অন্য কারণেও তাকে ডাকতে পারে। তাকে কঠিন কোনো নির্দেশ দিক তবু সে দুঃখ বা ব্যথা পাবে না।

অনেক ভাবনা চিন্তা করেও কোনো সমাধান খুঁজে পেলো না। জানে হরিহরের অবাধ্য হলে তাকে চরম শাস্তি পেতে হবে তাই ফাগুয়া ভোর বেলাতেই রওয়ানা দিলো ও গ্রামের উদ্দেশ্যে।

হরিহর একটা চাবুকে ধার দিচ্ছিলো। চাকু নয়, তীক্ষ্ণধার ছোরা বলা চলে।

তার পাশে বসেছিলো তার অনুচরদ্বয়।

হরিহর বললো–ফাগুয়ার ঘরে এমন মেয়ে আছে বলিস নিতো কোনোদিন তোরা?

বললো দিলু–হামরা অত কি দেখেছি কোনোদিন। ফাগুয়া বেটিকে ঘরে রাখে…

অপরজন নাম ওর গঙ্গা, বললো–হামি একবার ছোট্ট বেলায় ওকে দেখেছিলাম, তারপর অত বড় সেয়ানা হয়েছে একবার জানি না।

তা আর জানবি কেন তোরা তো শুধু ঘুঘু মেরে খাস্। আচ্ছা, ফাগুয়া এতক্ষণ এলোনা কেন রে? কথাটা বলে হরিহর চাকুর ধার হাতের আংগুলে পরীক্ষা করতে থাকে।

সূর্যের আলো তখনও শালবনে প্রবেশ করেনি, শালবৃক্ষের আগায় আগায় সবেমাত্র লুকোচুরি খেলছে। এমন সময় এসে দাঁড়ালো ফাগুয়া।

দু'চোখ গর্তের মধ্যে বসে গেছে। সমস্ত রাত অনিন্দ্রায় কাটিয়ে বেশ অসুস্থ বোধ করছিলো সে। তবু না এসে তো উপায় নেই, তাই এসেছে ফাগুয়া।

ফাগুয়াকে দেখে হরিহর চোখ তুললো তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ছুরিটা দোলাতে দোলাতে বললো ফাগুয়া তুই এসেছিস। জানি না এসে পারবি না।

বল সর্দার কেন ডেকেছিলি? বললো ফাগুয়া।

ফাগুয়ার সঙ্গে এসেছিলো রতন নামে এক পশী, সে সর্দারের সম্মুখে না এসে আড়ালে আত্মগোপন করে সব শুনছিলো এবং দেখছিলো।

ফাগুয়া যখন হরিহরকে জিজ্ঞাসা করলো কেন তাকে ডাকা হয়েছিলো, তখন হরিহর নরম কোমল সুরে বললোহাঁ রে ফাগুয়া তুই আমার বাপ চাচার বয়সী। হামাকে তুই খুব ভালবাসিস তাই না?

বললো ফাগুয়া—হাঁ বাসি! না বলে তো কোন উপায় ছিলো না। কতকটা জোর করেই কথাটা সে বললো।

হরিহর তাকালো তার অনুচরদ্বয়ের মুখের দিকে, তারপর তাকালো শালবনের মাথায় যেখানে সূর্য দেবতার আলোকরশ্মি ছড়িয়ে খেলা করছিলো।

বললো দিলুরাম–ফাগুয়া তোর মাইয়া রেশমাকে সর্দারের খুব পছন্দ......

কথাটা শোনা মাত্র ফাগুয়ার ধমনির রক্তে যেন আগুন ধরে গেলো, অতি কষ্টে নিজকে সংযত করে রাখলো ফাগুয়া।

এবার বললো গঙ্গা–কিরে অমন চুপ করে আছিস কেন? বল সর্দারের হাতে রেশমাকে দিবি কি না? জানিস্ তো সর্দারের যাকে পছন্দ তাকে না পেলে সর্দার পাগলা হাতি বনে যায়।

ফাগুয়া কোন উত্তর না দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো। মনের মধ্যে তার আগুন জ্বলে উঠেছে। এবারও সে চুপ রইলো মুখ খানাকে অপর দিকে করে।

হরিহর বললো–ফাগুয়া জবাব দে?

ফাগুয়া তবু নীরব।

দিলুরাম বলে উঠলো–ফাগুয়া তার বেটি রেশমাকে তোর হাতে তুলে দিতে রাজি নয় সর্দার।

গঙ্গা বললো–হা ফাগুয়ার মুখোভাব তাই বলছে। দেখছিসনা কেমন চুপ করে আছে?

বললো হরিহর–কিরে ফাগুয়া রাজি না অরাজি বল?

ফাগুয়া কঠিন কণ্ঠে বললো–জান নিয়ে নে তবু হামি রেশমাকে তোর হাতে দিবো না।

এক সঙ্গে গর্জে উঠলো হরিহর আর গঙ্গা–কি, কি বললি ফাগুয়া?

দিলুরাম বললো–শুনলিনা সর্দার, ফাগুয়া বললো জান দেবে তবু বেটি রেশমাকে তোর হাতে তুলে দেবে না।

হরিহর ক্ষিপ্তের ন্যায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। দু'চোখ দিয়ে তার আগুন ঠিকরে বের হলো। ইংগিত করলো সে তার সঙ্গীদ্বয়কে।

সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীদ্বয় ফাগুয়াকে এটে ধরে ফেললো। একজন দড়ি নিয়ে এলো মুহূর্ত অপেক্ষা না করে। বেঁধে ফেললো ফাগুয়াকে গাছে গুঁড়ির সঙ্গে।

হরিহর ছুরি হাতে এগিয়ে এলো।

ছুরিখানা ফায়ার চোখের সম্মুখে উঁচু করে ধরে বললো

এই ছুরি দিয়ে তোর শরীরের মাংস কেটে নেবো টুকরো টুকরো করে। বল রাজি...

না কিছুতেই হামি রেশমাকে তোর মত জানোয়ারের হাতে তুলে দেবো না।

কি বললি? ক্ষুদ্ধ শার্দুলের মত দাঁত, মুখ খিঁচিয়ে উঠলো হরিহার। ছোরা দিয়ে ফাগুয়ার শরীরের খানিকটা মাংস কেটে নেয় খচ করে।

আড়ালে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিলো রতন, সে ফাগুয়ার সঙ্গে এসেছিলো। দুহাতে চোখে ঢেকে ফেললো তারপর ছুটলো সে তার গ্রাম লক্ষ্য করে।

গ্রামে পৌঁছে ফাগুয়ার বৌ আর রেশমাকে সব কথা বললো। ফাগুয়ার বৌ আর রেশমা সকালে না দেখে বেশ চিন্তায় পড়েছিলো। একবার ওরা মনে করেছিলো হয়তো বা বনে গেছে কাঠ কাটতে কিন্তু যখন ঘরে কুঠার এবং রশি দেখতে পেলো তখন বুঝলো ফাগুয়া কাঠ কাটতে বনে যায়নি, তবে এত সকাল সকাল সে গেলো কোথায়।

রতন যখন এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো–ফাগুয়া দাদাকে হরিহর মেরে ফেললো। তার শরীরের মাংস কেটে নিচ্ছে। তখন বিস্ময়ে ফাগুয়ার বৌ আর রেশমা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠে রেশমা–বাপু হরিহর সর্দারের কি ক্ষতি করেছে তাই সে বাপুর শরীরের মাংস কেটে নিচ্ছে।

সে অনেক কথা পরে শুনবি এখন ফাগুয়া দাদাকে কি করে বাঁচান যায় বল? রতন তখনও রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

রেশমা তাকালো মায়ের মুখের দিকে।

মা তো বেচারী হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে।

রেশমা নিজেকে শক্ত করে নিলো।

রতনকে লক্ষ্য করে বললো রেশমা–রতন কাকা চল বাবুর কাছে যাই। জানিস, বাবুজী ঠিক আমাদের ভাল কথা জানবে। কি করতে হবে বলবেন তিনি।

ফাগুয়ার বৌ বললো–তাই চল আর দেরী করিস না।

রতন বললো–হাঁ তাই ভাল।

অসহায় ফাগুয়ার বৌ আর রেশমাও রতন ছুটলো বাংলো অভিমুখে।

সবে বনহুর আর মনিরা শয্যা ত্যাগ করে বাংলোর বারান্দায় এসে স্বল্প রৌদ্রে চেয়ার নিয়ে বসেছে। তারা নানা কথা নিয়ে আলোচনা করছে। ঠিক সেই দণ্ডে এসে হাজির হলো রতন রেশমা আর ফাগুয়ার বৌ। রীতিমত হাঁপাচ্ছে ওরা, সবার মুখমন্ডলেই উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে।

বনহুর আর মনিরা ব্যস্ত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।

বনহুর বললো–কি হয়েছে রেশমা?

বললো রেশমা বাবুজী হামার বাপুকে হরিহর ধরে নিয়ে গেছে। বাপুকে ওরা মেরে ফেলবে। দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠে রেশমা।

বনহুরের দৃষ্টি এবার ফাগুয়া বৌ এর মুখের উপর দিয়ে রতনের মুখে এসে স্থির হলো। বললো সে রতনকে লক্ষ্য করে–কি সংবাদ রতন? রেশমা যা বলছে তা সত্য।

রতনের পরিচয় পেয়েছিলো বনহুর পূর্ণিমা উৎসবে, তাই ওর নামটা স্মরণ ছিলো।

রতন বললো–হাঁ, রেশমা যা বলছে সত্য। হরিহর সর্দার ফাগুয়া দাদাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আটক করেছে। তারপর তারা শরীর থেকে ছুরি দিয়ে মাংস কেটে নিচ্ছে সর্দার–তাই তোর কাছে হামরা এসেছি বাবুজী, তুই যদি ফাগুয়া দাদাকে বাঁচাতে পারিস।

রতনও কাঁদতে লাগলো।

বনহুর মনিরার দিকে তাকিয়ে বললো–দেখলে, যা ভেবেছিলাম তাই সত্য হলো?

মনিরা বললো–কি ভেবেছিলে তুমি? আর ফাগুয়াকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটক করে মারধর করবে তাই বা কেমন করে বুঝতে পেরেছিলে?

বললো বনহুর–কাল যখন পূর্ণিমা উৎসবে রেশমা নাচছিলো তখন হরিহর তার দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ছিলো। জানো মনিরা, সে তার দু'পাশের অনুচরদ্বয়কে কিছু বলছিলো। তাই আমার মনে হয় ফাগুয়াকে আটক করার পিছনে রয়েছে একটা ইংগিত।

হাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। বেচারী ফাওয়াকে আটক করে তাকে ভীষণভাবে শাস্তি দিচ্ছে সে, তাতে কোনো ভুল নেই।

এখন কি করা আমার কর্তব্য, বলো মনিরা

তুমি সেখানে যাও এবং কেন ফাগুয়াকে আটক করেছে জানতে চাও?

হু, তাই করতে হবে।

শোন, হরিহরকে আমার খুব সুবিধের লোক বলে মনে হলো না। তার শরীরে যেমন তাগত তেমনি সে বদমাইস। বাবুজী, হামরা তাকে খুব ভয় করি।

রেশমা আর ফাগুয়ার বৌয়ের মুখমন্ডল ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। তারা অসহায় চোখে তাকাচ্ছে বাবুজী আর বৌরাণীর মুখের দিকে।

বনহুর বললোমনিরা, তুমি অপেক্ষা করো আমি হরিহরের ওখানে যাচ্ছি। রেশমা, তুমি তোমার বৌরাণীর কাছে থেকো।

মনিরা বললো–যাও, রেশমা থাকবে।

বনহুর রতন আর ফাগুয়ার বৌ সহ চলে গেলো।

মনিরা স্বামীকে বিদায় দিলো বটে কিন্তু মন তার প্রসন্ন হলো না। কেমন যেন একটা আশঙ্কা তার মনের কোণে উঁকি দিলো।

রেশমা বিষণ্ণ মনে দাঁড়িয়ে ছিলো। সেও জানে হরিহর কেমন লোক, কতবড় নরপশু সে। বাবুজী গেলো, তার যদি কোনো অমঙ্গল ঘটে! রেশমা তাকাচ্ছিলো বৌরাণীর মুখের দিকে।

মনিরা তাকিয়ে ছিলো স্বামীর চলে যাওয়া পথের দিকে।

রেশমা বললো–বৌরাণী!

মনিরা চমকে উঠলো, কারণ সে তখন তন্ময় হয়ে স্বামীর কথা ভাবছিলো। ভাবছিলো, বেশ শান্তিতে কদিন কেটে গেলো, পরম নিশ্চিন্তে বলা যায়। এত আনন্দ, এত সুখ বুঝি তার জীবনে কোনোদিন আসেনি। এখানে আসার পর স্বামীকে সে একান্ত আপন করে পেয়েছিলো নিবিড়ভাবে। সর্বক্ষণ সে তার পাশে পাশে থাকতো–কত কথা, কত হাসি, কত আনন্দ ছিলো তাদের মনে। হঠাৎ একি কালো মেঘ উঁকি দিলো তার জীবনে। রেশমার ডাকে চমকে ফিরে তাকালো মনিরা।

রেশমা বললো–বৌরাণী, তোর মত হামারও ভয় হচ্ছে। হরিহর খুব খারাপ লোক, তাই……

মনিরা মনোভাব গোপন রেখে মুখে হাসি টেনে বললোনা, ভয় কিসের, তোদের বাবুজীর কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

হাঁ, বৌরাণী, তাই যেন হয়। বাবুজী বড় ভাল মানুষ। আমার বাবুর জন্যি তার যদি কোনো ক্ষতি হয় তাহলে আমরা বাচবো না…বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে রেশমার কণ্ঠস্বর।

মনিরা তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য নিজকে প্রফুল্ল রেখে বললো–বাবুজীর কিছু হবে না–তাকে কেউ কিছু করতে পারবে না।তোর বাবুজীর উপর ঈশ্বরের দোয়া আছে, বুঝলি?

হা বৌরাণী, বুঝেছি!

রেশমা?

বল বৌরাণী

এখানে তোমার কেমন লাগে?

কোথায় বৌরাণী?

এই শালবনে?

খুব ভাল লাগে।

যদি তোকে শহরে নিয়ে যাই, যাবি আমার সঙ্গে?

হামার বাপু হামার মা কাঁদবে যে

তুই কাঁদবি না?

রেশমা কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে থাকে।

মনিরা বলে–আয় রেশমা ঘরে আয়, বসে গল্প করি।

চল্ বৌরাণী।

ঘরে এসে বসে মনিরা, রেশমাকে হাত ধরে বসিয়ে দেয় পাশে।

বললো মনিরা–রেশমা, তুমি যদি ফাগুয়া আর ফাগুয়ার বৌয়ের মেয়ে না হয়ে শহরের কোনো সভ্য মানুষের মেয়ে হতে, তাহলে খুশি হতে না দুঃখ পেতে, ঠিক করে বলো তোর

একটু চুপ থেকে বললো রেশমানা বৌরাণী, হামি হামার বাপু আর মায়ের কাছে বেশ আছি।

একথা সেকথায় সময় কাটায় মনিরা, কিন্তু মন তার অস্থির হয়ে উঠে। এতক্ষণও ফিরে আসছে না কেন বনহুর, সেটাই তার চিন্তা।

ওদিকে বনহুর আর রতন যখন হরিহরের উঠানে এসে দাঁড়ালো ঠিক তখনি হরিহর ফায়ার দু'চোখে অগ্নিদগ্ধ লৌহশলাকা প্রবেশ করাতে উদ্যত হয়েছিলো।

বনহুর আর রতন এসে দাঁড়াতেই ফিরে তাকালো হরিহর।

দু'চোখে তার আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। বনহুর আর রহমানকে দেখে ক্ষুদ্ধ শার্দুলের মত গর্জে উঠলো, বাঁকা চোখে কুঁচকে বললো হরিহর বাবুজী তুই এসেছিস?

হাঁ এলাম।

হরিহর রতনের দিকে তাকিয়ে কঠিন কণ্ঠে বললো–তুই বুঝি বাবুকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিস?

রতন কোনো কথা বলে না, তার মুখমন্ডল বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। হরিহরের ভয়ঙ্কর চেহারা আর তার হস্তস্থিত অগ্নিদগ্ধ লৌহশলাকা দেখে রতনের হৃৎপিন্ড থর থর করে কাঁপছিলো।

হরিহর রতনের দিকে এগুতেই বনহুর তার পথরোধ করে দাঁড়ালো।

ফাগুয়া বলে উঠলো–বাবুজী!

বনহুর রতন আর হরিহরের মাঝে দাঁড়াতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো হরিহর।

বনহুর বললো–এদিকে না এগিয়ে ফাগুয়ার দিকে এগিয়ে যাও হরিহর। ওর বাধন খুলে দাও।

হরিহর দাঁত বের করে বিকট শব্দে হেসে উঠলো, তারপর হাসি থামিয়ে বললো–ফাগুয়ার বাঁধন খুলে দেবো? না, তা হবে না! ওর মাইয়া রেশমাকে হামার চাই। তাকে যদি এনে দেয়, তবেই ওর বাধন খুলে দেবো……

নইলে দেবে না?

না, হামি ওর জান কেটে টুকরো টুকরো করবো।

বনহুর বললো দিতে হবে।

না।

সত্যি?

হাঁ।

বনহুর সাথে সাথে প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দেয় হরিহরের মুখে।

হরিহর উবু হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়।

বনহুর ওর ঘাড়ের কাছের জামা ধরে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়, তারপর বলে যাও, খুলে দাও ফাগুয়ার বাধন।

অগত্যা হরিহর বাধ্য হলো ফাগুয়ার বাধন খুলে দিতে।

বনহুর ফায়ার অবস্থা দেখে ব্যথিত হলো। তার দেহের স্থানে স্থানে গভীর ক্ষত, সেই ক্ষত দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ঐ জায়গাগুলো থেকে হরিহর মাংস কেটে নিয়েছিলো।

হরিহর ফাগুয়ার বাঁধন খুলে দিয়ে সরে যায়।

বনহুর আর রহমান ফাগুয়াকে ধরে নিয়ে চলে বাড়ি অভিমুখে।

ফাগুয়া বলে–আবুজী, তুই আমাকে বাঁচালি, নাহলে এতক্ষণ হরিহর সর্দার হামার চোখ দুটো কানা করে দিতো।

যখন বনহুর আর রতন ফাগুয়াকে নিয়ে তাদের বাড়ি পৌঁছলো তখন মনিরা, রেশমা, আর গ্রামের সাঁওতাল নারীপুরুষ এসে জড়ো হয়েছে ফাগুয়ার উঠানে।

সবার চোখেমুখেই আতঙ্কের ছাপ, উদ্বিগ্নভাবে প্রতীক্ষা করছে সকলে। বাবুজী ফাগুয়াকে আনতে গেছে, তার সঙ্গে গেছে রতন। কি অবস্থায় তারা ফিরে আসবে কে জানে। হরিহর তাদের সর্দার বটে কিন্তু তার প্রতি তাদের কারও শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি নেই। তাকে যতটুকু মান্য করে তা শুধু অত্যাচারের ভয়ে।

যখন সবাই ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তখন ফাগুয়াকে রক্তাক্ত অবস্থায় ধরে ধরে নিয়ে আসে বাবুজী আর রতন।

রেশমা বললো–বাপু, একি হয়েছে তোর? সারা শরীরে তোর রক্ত…

ফাগুয়ার বৌ স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো।

সাঁওতাল পল্লীর নারীপুরুষ সবাই ফাগুয়ার অবস্থা দেখে মর্মাহত হয়ে পড়লো। সর্দারের বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বলতে পারছে না। সবাই তাকাচ্ছে এ–ওর মুখের দিকে।

ফায়ার করুণ অবস্থা সবার মনেই যে একটা ভীষণ আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হরিহর সর্দারের আচরণ তারা যদিও পূর্ব হতেই অবগত ছিলো, তবু নতুন করে যেন ফাগুয়ার অবস্থা তাদের হৃদয়ে দারুণ ভীতির সঞ্চার করলো।

সবাই এক এক করে সরে পড়লো।

মনিরা আর বনহুর ফাগুয়ার জন্য বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো। রতনকে শহরে ডাক্তার ডাকতে পাঠালো তারা।

ফাগুয়াকে বাঁচাতে হলে তার ভালভাবে চিকিৎসা হওয়া দরকার।

রতন ফাগুয়াকে বড় ভালবাসতো, সে মুহূর্ত বিলম্ব না করে ছুটলো শহর অভিমুখে। অবশ্য বনহুর তার গাড়ি নিয়ে নিজেও যেতে পারতো কিন্তু শহরে গেলে তাকে কেউ চিনে ফেলতে পারে, তখন হয়তো নতুন এক বিপদের সূত্রপাত হতে পারে।

বনহুর অবশ্যকিছুটা পথ রতনকে গাড়িতেই এগিয়ে দিল, যাতে সে শীঘ্র শহরে পৌঁছতে পারে এবং ডাক্তার সহ ফিরে আসতে পারে।

রতন ডাক্তার সহ ফিরে না আসা পর্যন্ত বনহুর গাড়ি নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করবে বলেছিলো রতনকে।

ডাক্তার সহ রতন ফিরে এলো এক সময়।

বনহুর ডাক্তার ও রতনকে তুলে নিলো গাড়িতে এবং যতদূর সম্ভব দ্রুত গাড়ি চালিয়ে ফিরে এলো সেই সাঁওতাল পল্লীর শালবনের ডাকবাংলোয়।

গাড়িতে বসেই ডাক্তার যেন কেমন চমকে উঠেছিলো। সাঁওতাল যুবকের সঙ্গে এমন এক ব্যক্তির পরিচয় হলো কি করে এবং কে এই ব্যক্তি জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন ডাক্তার। একটা সন্দেহের দোলা লাগলো ডাক্তারের মনে।

ডাক্তার কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি কিছুতেই নিজের মনোভাব প্রকাশ করলেন না বা জানতে দিলেন না।

শালবন সাঁওতাল পল্লীতে এসে ফাগুয়াকে দেখলেন এবং ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করলেন। ডাক্তারের মনে আরও বেশি সন্দেহ জাগলো–কি ব্যাপার, কে এই ব্যক্তি যারা স্বামী–স্ত্রী উভয়ে মিলে একটা সাঁওতাল পল্লীতে ডাকবাংলোয় বাস করছেন আর সাঁওতাল এক ব্যক্তির জন্য তাদের এত দরদ।

ফাগুয়ার অবস্থা পরীক্ষা করে ডাক্তারের মনে নানা প্রশ্ন জেগেছিলো। তিনি বনহুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—এর কি হয়েছে বা হয়েছিলো জানা দরকার মনে করছি–কারণ আমরা ডাক্তার, সব খুঁটিনাটি না জেনে চিকিৎসা করতে পারি না।

বনহুর ডাক্তারকে ঘটনাটা সংক্ষেপে জানালো। হরিহর যে কতবড় শয়তান তাও ভালভাবে জানালো বনহুর ডাক্তারকে।

ডাক্তার ক্রমেই সচ্ছ হয়ে এলেন বনহুর আর মনিরার কাছে। বনহুর সাঁওতাল ফাগুয়ার কেউ না হলেও তার হিতাকাক্ষী। ফাগুয়া তার অনেক উপকার করেছে তাই তারাও তার উপকার করতে চায়।

ডাক্তারকে ফাওয়ার চিকিৎসা ব্যাপারে যত টাকা লাগে তাই তাকে দেবে জানালো বনহুর।

ডাক্তার ফাগুয়াকে প্রয়োজনমত ওষুধ ও ইনজেকশান দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। যাবার সময় বনহুর তার প্রাপ্য অর্থের চেয়ে ঢের বেশি অর্থ প্রদান করলো এবং নিজের গাড়িতে রতনকে দিয়ে শহর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলো।

ডাক্তার আবার কবে ফাগুয়াকে দেখতে আসবেন এ কথা জেনে নিলো বনহুর, কারণ ঐদিন সে ডাক্তারকে নিতে আসবে বলে কথা দিলো ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার বাড়ি ফিরে ভাবতে শুরু করলেন, কে এই ব্যক্তি যার আচরণ অদ্ভুত। যে দেখতে সাধারণ ব্যক্তির মত নয়। যার নিকটে রয়েছে প্রচুর অর্থ......যতই ভাবেন ডাক্তার ততই বিস্মিত হল। ভুলে যান তিনি রোগীর কথা, শুধু তার মনে উদয় হতে থাকে শালবনের নিভৃত এক ডাকবাংলোয় এমন এক জুটি কারা এরা?

*

কি বললি দিলুরাম ঐ বাবু ফাগুয়ার চিকিৎসার জন্য শহর থেকে ডাক্তার এনেছিলো? কথাটা বলে হরিহর তাকালো তার সহচর দিলুরামের মুখের দিকে।

দিলুরাম বললো–হাঁ সর্দার, হামি নিজের চোখে দেখেছি রতনকে দিয়ে ডাক্তারকে নিজের গাড়িতে

শহরে পৌঁছে দিলো।

হাঁ, আমি সেদিনের কথা ভুলিনি। বাবু হামাকে মারলো আর আমি তাকে ছেড়ে দিবো। শুধু বাবুকে নয়, বাবুর বৌকেও হামি দেখে নিবো। তারপর ফাগুয়া আর তার বেটি রেশমা......হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ...

দিলুরাম বললো–বাবু কিন্তু খুব শক্তি রাখে। সর্দার, তুই পারবি তো বাবুর সঙ্গে।

ঐদিন পারিনি বলে পারবো না ভেবেছিস্ দিলু? ঠিক এবার দেখে নেবো বাবুকে। আজ রাতেই বাবুর উপর হামলা চালাবো, বাবু আর বাবুর বৌকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবো।

সর্দার, তুই যা বলেছিস একেবারে খাঁটি কথা। বাবু কেন নাক গলাতে এসেছে আমাদের কাজে।

বললো হরিহর–দিলু আজ রাতেই শেষ করে দিবো বাবুকে আর বাবুর বৌকে, বুঝলি?

হাঁ বুঝেছি! বললো দিলু।

আড়াল থেকে শুনলো এক সাঁওতাল তরুণী–কিঙ্করী। যাকে সর্দার হরিহর জোর করে ধরে এনে তার উপর সে চালিয়েছিলো পাশবিক অত্যাচার। সেই থেকে কিঙ্করী রয়ে গেছে সর্দারের বাড়িতে। অবশ্য সে বাড়ি ফিরে যাবার ইচ্ছা পোষণ করেছিলো কিন্তু সমাজ তাকে ফিরে নেয় নি। সেই থেকে কিঙ্করী কতকটা বাধ্য হয়ে রয়ে গেছে এখানে। থাকলে কি হবে, সর্দারকে সে মোটেই পছন্দ করত না। সর্দার যখন ফাগুয়াকে ধরে নিয়ে এসে তার উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিলো তখন কিঙ্করীর বুকটা হা হা করে কাঁদছিলো, কারণ সে জানে শয়তান হরিহর কত সাংঘাতিক আর হৃদয়হীন। তার বাবাকেও ধরে এনে এমনিভাবে শাস্তি দিয়েছিলো সে। কিঙ্করী আড়াল থেকে শুনলো, তারপর গোপনে ছুটলো সে বাবুর কাছে।

তখন মনিরা আর বনহুর ডাকবাংলোর সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো, এমন সময় কিঙ্করী এসে দাঁড়ায়, এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে বুজী, একটা কথা কইতে আইলাম।

কে তুমি? কি নাম তোমার?

হামি হরিহর সর্দারের বাড়ি থেকে আসছি–বাবুজী, হামার নাম কিঙ্করী। বাবুজী, আজ রাতে তোরা যখন ঘুমিয়ে থাকবি–তখন সর্দার হরিহর তোদের পুড়িয়ে মারবে।

মনিরা বললো–সর্বনাশ, দেখলে শয়তানটা কি মতলব এঁটেছে। আমার কিন্তু আর এক মুহূর্ত এখানে ভাল লাগছে না, চলো চলে যাই।

বনহুর একটা শব্দ করলো–হু। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো তারপর বললো–হরিহর দেখছি উচিত সাজা নেবার জন্য আমাকে উৎসাহিত করে তুলছে।

নানা, আর তুমি ওদের সঙ্গে লেগো না। আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগছে না। সত্যি, এতদিন বেশ ছিলাম.......তোমাকে পেয়েছিলাম একান্ত, নিভৃতে নিশ্চিন্তে। এবার একটা কালোমেঘ ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে আসছে আমার মনের আকাশে।

বনহুর বললো–তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মনিরা, সর্দার হরিহরকে আমি উচিত সাজা দেবে। তারপর সাঁওতাল তরুণীর দিকে তাকিয়ে বললো বনহুর–কিঙ্করী, তুমি এ সংবাদ বহন করে এনেছে? সেইজন্য তোমাকে আমরা অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কিঙ্করী পূর্বের মত ব্যস্ত কণ্ঠেই বললো–বাবুজী, তোরা পালিয়ে যা। জানিস না ঐ শয়তান কত পাজি। তুই ফাগুয়াকে সর্দারের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছিস, সেই রাগ ওর শরীরে আগুন জ্বেলে দিয়েছে। ফাগুয়া আর ওর মাইয়্যা রেশমা শয়তানটার হাত থেকে উদ্ধার পাবে না। বাবুজী.....কাঁদতে কাঁদতে বলে–হামার বাবুকে এ হরিহর শয়তান ধরে এনে খুব মেরেছিলো, তারপর ধরে এনেছিলো হামাকে। হামার বাপু মাইর সহ্য করতে পারলো না, মরে গেলো। আর শয়তান হামাকে ওর বন্দীখানায় আটক করে রাখলো। কণ্ঠ ধরে এলো কিঙ্করীর।

বনহুর বললো–আমি সব বুঝতে পেরেছি। যা ভাগ্যে ছিলো ঘটে গেছে। এবার আর কারও ক্ষতি যেন সে করতে না পারে.....বলে থামলো বনহুর। তারপর বলল–তুমি যাও।

আচ্ছা বাবুজী, আমি যাচ্ছি। সেলাম বৌরাণী–সেলাম বাবুজী...সেলাম জানিয়ে কিঙ্করী যেমন সন্তর্পণে এসেছিলো, তেমনি চলে যায়।

মনিরা তাকায় স্বামীর মুখের দিকে।

সেখানে সে দেখতে পায় কঠিন এক কর্তব্যের আভাস।

*

হরিহর তার চারজন অনুচর সহ এগিয়ে চলেছে। সবার মুখেই হিংস্র পশুত্ব ভাব ফুটে উঠেছে। সবার হাতেই এক একটা মশালকিন্তু মশালে আগুন নেই। অতি সাবধানে শালবনে আত্মগোপন করে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে ওরা। আজ ঘুমন্ত অবস্থায় বাবু আর তার বৌকে পুড়িয়ে মারবে তারা।

শালবন অতিক্রম করে ফাগুয়াদের বাড়ির পিছন হয়ে এক সময় পৌঁছে গেলো তারা ডাকবাংলোর কাছাকাছি। হরিহর ইংগিত করলো, সঙ্গে সঙ্গে সবাই মশালে আগুন জ্বালিয়ে ফেললো। তারপর তারা প্রতীক্ষা করতে লাগলো সর্দারের ইংগিতের।

হরিহর এবার বাংলোয় আগুন ঘরিয়ে দেবার জন্য ইংগিত করলো।

অমনি ডাকবাংলোয় আগুন জ্বলে উঠলো দাউদাউ করে। তার ডাকবাংলোয় আগুনের লেলিহান শিখা মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। সাঁওতাল পল্লী লালে লাল হয়ে উঠলো।

চারদিক থেকে ছুটে এলো সাঁওতাল নারীপুরুষ, কিন্তু পথেই তারা বাধা পেলোযেদিক দিয়েই তারা এগুলো সেইদিকেই দেখলো হরিহরের লোক সূতীক্ষ্ণ ধার বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

সাঁওতাল নারীপুরুষ সবাই বুঝতে পারলো, এ কাজ হরিহরের এবং সেই ডাকবাংলোয় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বাবুজী আর তার বৌকে পুড়িয়ে মারবে। সবাই হায় হায় করে উঠলো এবং মনে মনে বাবুজী আর তার বৌয়ের জন্য ডুকরে কাঁদতে লাগলো কিন্তু প্রকাশ্যে কাউকে কিছু কেউ বলার সাহসী হলো না।

ফাগুয়া ও তার বৌ কেঁদে কেটে আকুল হলো।

রেশমা তো আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো, চিৎকার করে সে কেঁদে উঠলোবাবুজী– বাবুজী...বৌরাণী–বৌরাণী...সঙ্গে সঙ্গে ওকে ধরে ফেললো কয়েকজন সাঁওতাল রমণী।

রেশমার আর্তচিৎকারে ভরে উঠলো চারদিক।

তখন ডাকবাংলো দাউদাউ করে জ্বলছে।

ফাগুয়ার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো, সে বুঝতে পারলো, হরিহর সর্দার তারই জন্য বাবুজী আর বৌরাণীকে পুড়িয়ে মারলো। একেবারে মুষড়ে পড়লো সে, কারণ হরিহর এবার তাকে রেহাই দেবে না।

এদিকে যখন ডাকবাংলোয় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে তখন একটা উঁচু টিলার উপরে দাঁড়িয়ে বন সিগারেট থেকে ধুয়া নির্গত করে চলেছে। তার মুখমন্ডল প্রসন্ন শান্ত, হরিহর তাকে হত্যার জন্য ডাকবাংলো জ্বালিয়ে দিলো তবু এতটুকু ভাবের পরিবর্তন আসেনি তার মধ্যে।

অদূরস্থ ডাকবাংলোর লেলিহান অগ্নিশিখার লালচে আলো এসে পড়েছে বনহুরের মুখে। মনিরা তাকিয়েছিলো নিস্পলক নয়নে স্বামীর মুখের দিকে।

ডাকবাংলো ঘিরে সাঁওতালদের আর্তচিৎকার তাদের কানে এসে প্রবেশ করছিলো। রেশমার চিৎকার সব আর্তনাদ ছাপিয়ে ভেসে আসছিলো স্পষ্ট হয়ে।

মনিরা বললো–শুনতে পাচ্ছো?

হাঁ, রেশমার আর্তনাদ, বেচারী…

এরপর কি করবে?

মনিরা–ভেবেছিলাম কিছুদিন নির্জনে নিশ্চিন্তে কাটাবো, কিন্তু ভাগ্য আমাকে নির্জনে নিশ্চিন্তে কাটাতে দিলো না। একটু থেমে দাঁতে দাঁত পিষে বললো বনহুর– শয়তান হরিহর জানে না আমার কাছে ওর পরিত্রাণ নেই।

ওগো চলো আমরা অন্য কোথাও যাই–গাড়িখানাতে ওরা নষ্ট করে নি।

হাঁ, গাড়িখানা ওরা মানে হরিহর ও তার দলবল নষ্ট করে নি এবং করবেও না! ওরা জানে আমাকে আর তোমাকে আগুনে পুড়ে ছাই করে ফেললো, গাড়িখানা তো আর কোনো অন্যায় করে নি।

তুমিই বা কি অন্যায় করেছিলে?

হরিহরের গ্রাম থেকে ফাগুয়া আর তার মেয়ে রেশমাকে ছিনিয়ে নিয়েছিলাম, তাই…

ঐ দেখো আগুন আরও তীব্র হয়ে জ্বলে উঠছে। সমস্ত বাংলো ছেড়ে গেছে অগ্নিশিখায়। সাঁওতাল নারীপুরুষগুলো কেমন এলোপাতাড়িভাবে ছুটাছুটি করছে....

হাঁ, আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে?

কি? বললো মনিরা।

বনহুর হাতের আংগুল থেকে অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা নিক্ষেপ করে বললো– সাঁওতাল নারীপুরুষ সবাই ছুটাছুটি করছে কিন্তু কেউ বাংলোর আগুন নিভাতে অগ্রসর হতে সাহসী হচ্ছে না।

কেন?

কারণ হরিহরের ভয়ে সাঁওতালগণ সবাই সংকুচিত হয়ে পড়েছে যদিও তাদের মনে আমার আর তোমার জন্য সহানুভূতি শেষ ছিলো না, তবু তারা নীরব দর্শক বনে গেছে।

হাঁ, তুমি ঠিক বলেছো, অগ্নিশিখার আলোতে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সাঁওতাল নারীপুরুষ সবাই কেমন যেন তাক লেগে গেছে।

বনহুর মনিরাকে লক্ষ্য করে বললো–চলো মনিরা, আপাতত টিলার আড়ালে কোনো নির্জন জায়গায় বিশ্রামের জায়গা করে নেই।

মনিরা বললো–চলো।

বনহুর মনিরাকে সঙ্গে করে নেমে এলো টিলার নিচে।

*

হরিহরের আনন্দ আর ধরে না।

অনুচরদের আদেশ দিলো এবার ফাগুয়া আর রেশমাকে পাকড়াও করে নিয়ে এসো।

সর্দারের আদেশ পাওয়ামাত্র তার অনুচরগণ ছুটলো ফাগুয়া আর রেশমাকে পাকড়াও করে আনার জন্য।

হরিহর আনন্দে আটখানা, এবার কেউ তাকে বাধা দিতে আসবে না। বাবুজী আর তার বৌকে জীবন্ত ডাকবাংলোর কক্ষে পুড়িয়ে মারা হয়েছে।

সাঁওতাল পল্লীর সবাই বিমর্ষ মলিন, সবার মুখেই দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। এবার হরিহর তাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে কারণেই সবাই ভীত আতঙ্কিত।

হরিহরের অনুচর দু'জন গিয়ে ধরে আনলো ফাগুয়া আর রেশমাকে। ফাওয়ার সমস্ত শরীরে ক্ষত, ব্যথা–বেদনায় তার অবস্থা বড় শোচনীয়। অসহায় ফাগুয়া নীরবে এসে দাঁড়ালে সর্দার হরিহরের সম্মুখে।

তার পিছনে হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা রেশমা। ফাগুয়ার চেহারায় অসহায় ভাব ফুটে উঠলেও রেশমার মুখে করুণ ভাব ফুটে উঠলো না, সে দৃঢ় মনোভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হরিহর একটা কাষ্ঠখন্ডের উপরে বসেছিলো, সে রেশমা আর ফাগুয়াকে দেখে নিলো, তারপর হেসে উঠলো হাঃ হাঃ হাঃ করে। হাসি থামিয়ে এগিয়ে এলো হরিহর রেশমার পাশে, বাঁকা চোখে সে রেশমার দিকে তাকিয়ে বললো বাবুজী কোথা, এবার কে তোর বাপু আর তোকে হামার হাত থেকে উদ্ধার করবে বল?

রেশমা কোনো জবাব দিলো না।

ফাগুয়া তাকালো হরিহরের দিকে। এখানে কেউ নেই যে ফাগুয়া ও তার বেটির উপর রহম করে।

হরিহর বললো–দিলু, তুই ফাগুয়াকে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেল। আর রেশমার হাতের রশি খুলে দে শিমলা তুই–আর আমার চাবুকটা এনে দে জবরু।

আদেশ পালন করলো দিলু, ফাগুয়াকে সম্মুখের শালগাছটার সঙ্গে রশি দিয়ে বাঁধলো মজবুত করে।

ফাগুয়া কোনো শব্দ করলো না, আর করেই বা কি লাভ হবে! মৃত্যু তার অনিবার্য জানে সে। শয়তান হরিহর তাকে কিছুতেই মুক্তি দেবে না। অসহায় চোখে সে কন্যার দিকে তাকাচ্ছে বারবার।

শিমলা খুলে দিলো রেশমার হাতের বাঁধন।

ততক্ষণে জবরু একটা চাবুক এনে দিয়েছে হরিহরের হাতে।

হরিহর হিংস্রভাবে পায়চারী করছে...সে যেন একটা জীবন্ত শয়তান। তার আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে তার অনুচরগণ। ওরা এক একজন যেন এক একটা ভয়ঙ্কর জীব। অসহায় ফাওয়া আর রেশমা এদের শিকার।

হরিহর চাবুক নিয়ে রেশমার সম্মুখে এসে দাঁতে দাঁত পিষে বলে–সেদিন বাবুজীকে খুব নাচ দেখালি, আজ হামাকে নাচ দেখা। নাছ না বলছি......

রেশমা নীরব, সে দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে এমনভাব দেখায় যেন সে হরিহরের কথা শুনতেই পায় নি।

হরিহর ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় হুম্ করে উঠে, তারপর সে বলে কি রে, হামার কথা তুই শুনতে পাচ্ছিস না?

তবু রেশমা নীরব।

হরিহর গর্জে উঠলো ভীষণ শব্দ করে–রেশমা না বলছি। সঙ্গে সঙ্গে হরিহরের চাবুক এসে পড়লো রেশমার শরীরে।

ফাগুয়ার বুকটা থর থর করে কেঁপে উঠলো, চাবুকের আঘাতটা যেন ফাগুয়ার পিঠেই পড়লো, তাকালো সে ওর মুখের দিকে।

রেশমা বললো–নাচবো না, তুই আমাকে মার, কত মারবি মার।

কি বললি! গর্জে উঠলো আবার হরিহর এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার চাবুকখানা গিয়ে পড়লো রেশমার পিঠে।

রেশমা এবার কাবু হয়ে পড়লো, যন্ত্রণায় মুখখানা তার বিকৃত হয়ে উঠলো। পুনরায় চাবুক পড়ার পূর্বেই রেশমা নাচতে শুরু করলো।

হরিহর খুশিতে আনন্দধ্বনি করে উঠলোররে…হররে…হুররে……

নাচ শেষ হয়, হরিহর ধরে ফেলে রেশমাকে, তাকে আকর্ষণ করে নিজের দিকে।

রেশমা আর্তনাদ করে উঠলো।

হরিহরের অনুচরগণ হর্ষধ্বনি করে উঠল।

রেশমার আর্তচিৎকারে শালবনের পাতাগুলো যেন থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো ভীষণ আতঙ্কে। হরিহর রেশমাকে যখন আকর্ষণ করলো তখন রেশমা নিজের দাঁত দিয়ে হরিহরকে কামড়ে দিলো খুব জোরে।

তবু হরিহর কাবু হলো না, সে আরও তীব্রভাবে আক্রমণ করলো রেশমাকে।

ফাগুয়া দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো লজ্জায় দুঃখে ব্যথায়।

ঠিক ঐ মুহূর্তে বনহুর প্রবেশ করলো সেখানে।

বনহুরকে দেখামাত্র আনন্দভরা কণ্ঠে বলে উঠলোবাবুজী তুই বেঁচে আছিস…

হরিহরের দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠে, সে যেন মুহূর্তে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো, ছেড়ে দিলো সে রেশমাকে। ভেবে পায় না হরিহর, যে বাবুজী তার বৌকে ডাকবাংলোয় পুড়িয়ে মেরেছে, সেই বাবুজী কি করে সশরীরে এখানে হাজির হলো। একেবারে হতবাক হয়ে পড়লো হরিহর কিছু সময়ের জন্য। শুধু হরিহরই নয়, তার অনুচরগণও স্তম্ভিত হয়ে গেলো।

কিন্তু হরিহর বেশিক্ষণ থ' মেরে দাঁড়াবার লোক, নয় সে তার হস্তস্থিত চাবুক নিয়ে আক্রমণ করলো বাবুজীকে।

বনহুর সে জন্য প্রস্তুত ছিলো।

হরিহর তাকে আক্রমণ করতেই সে প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলো হরিহরের নাকের উপর। সঙ্গে সঙ্গে হরিহর পড়তে পড়তে নিজকে সামলে নিলো একটা গাছের গুঁড়ি আকড়ে ধরে। নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লো বটে কিন্তু সে দমে গেলো না, পুনরায় আক্রমণ করলো।

হরিহর নিজের না পেরে তার সঙ্গীদের এগুতে ইংগিত করলো, তারাও আক্রমণ করলো বনহুরকে।

শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ।

কিন্তু বেশিক্ষণ বনহুরের সঙ্গে পারলো না হরিহর। সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো ভূতলে।

বনহুর হরিহরের সঙ্গীদের উপর এবার ঝাঁপিয়ে পড়লো, তাদের কাবু করতে বেশি সময় লাগলো না। ওরা কে কোন দিকে পালালো তার ঠিক নেই।

বনহুর এবার নিজে খুলে দিলো ফাগুয়ার বাধন।

তারপর রেশমা আর ফাগুয়াকে সঙ্গে নিয়ে চললো সে ফাগুয়াদের বাড়ি অভিমুখে। কিন্তু বেশিদূর এগুতে না এগুতেই একটা বিরাট জাল এসে পড়লো বনহুরের মাথার উপর। ঠিক ফাঁদের মত জালখানার মধ্যে আটকে পড়লো বনহুর।

এমন অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলো না সে, হঠাৎ সুকৌশলে হরিহর জালখানা বনহুরের মাথায় নিক্ষেপ করেছে যেন সে নড়াচড়া করতে না পারে।

ফাগুয়া আর রেশমা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো।

ততক্ষণে দু'পাশ থেকে দুজন অনুচর রেশমা আর ফাগুয়াকে ধরে ফেললো। তারা ধরে রাখলো ওদের দু'জনকে। ততক্ষণে বিশ পঁচিশজন সাঁওতাল সূতীক্ষ্ণধার বর্শা হাতে ঘিরে ফেলেছে বনহুরকে।

বনহুর জাল ছিঁড়ে বের হতে চেষ্টা করলো কিন্তু এত মজবুত জালের রশি ছিঁড়ে ফেলা সম্ভব হলো না তার পক্ষে।

মোটা এবং মজবুত রশি দিয়ে বনহুরকে বেঁধে ফেললো হরিহর ও তার দলবল। জাল কেটে তাকে বের করা হলো, তারপর একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধলো তাকে শক্ত করে।

বনহুর নিশ্চুপ, এমনভাবে তাকে বন্দী হতে হবে ভাবতে পারেনি সে।

শুধু বনহুরকেই ওরা গাছের সঙ্গে বাধলো না, ফাগুয়া ও রেশমাকেও বাঁধলো। তিনজনকে তিনটা গাছের সঙ্গে বেঁধে মাঝখানে অগ্নিকুন্ড জ্বালালো।

শুকনো কাঠের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।

মনিরা ফাগুয়াদের কুঠরিতে বসে প্রতীক্ষা করছিলো, না জানি কখন ফিরবে ও রেশমা আর ফাওয়াকে নিয়ে। হঠাৎ আচমকা চমকে উঠলো মনিরা, প্রায় দৌড়ে এসে প্রবেশ করলো রতন, রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে।

মনিরার বুকটা অজান্তে কেঁপে উঠলো। নিশ্চয়ই ওর কোনো অমঙ্গল ঘটেছে, নাহলে রতন এভাবে দৌড়ে আসবে কেন? মনিরা ব্যস্তকণ্ঠে বললো–কি হয়েছে রতন? বাবুজী কোথায়? তোমাদের বাবুজী……

রতন প্রায় কেঁদে ফেলে বললো–বৌরাণী, বাবুজীকে হরিহর সর্দার পাকড়াও করেছে…তাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারবে। বাবুজীকে বাঁচা বৌরাণী, বাবুজীকে বাঁচা…..

মনিরা বলে উঠলো–ও হরিহরের কবলে পড়েছে, বলল কি রতন। হাঁ বৌরাণী।

তাহলে এখন উপায়?

বৌরাণী, তুই ভাবিস না, ঈশ্বর বাবুকে বাঁচায়ে নিবে। যেমন করে আগুন থেকে বাঁচায়ে নিয়েছিলো। কথাগুলো ফাগুয়ার বৌ কাঁদতে কাঁদতে বললো।

মনিরা বললো–ফাগুয়া আর রেশমা কোথায় রতন?

হরিহর সর্দার তাদের ধরে রেখেছে বৌরাণী। বাবুজীকে মাঝের গাছটার সঙ্গে বেঁধেছে আর ফাগুয়া দাদা আর রেশমাকে বাবুজীর দু'পাশে দুটো গাছের সঙ্গে বেঁধেছে। মাঝখানে আগুন……..

তুমি দেরী করো না। রতন, যাও দেখোগে ওরা তোমার বাবুজীকে কি করে। তারপর আমি আসছি–নিজে গিয়ে দেখবো শয়তান হরিহর কি করে।

বৌরাণী, তুই দেরী করিনা, বাবুজীকে বাঁচা আর ফাগুয়া দাদা আর বেটি রেশমাকে বাঁচা,…..

মনিরা ভেবে পায় না কি করবে সে, কেমন করে বাঁচাবে স্বামী আর ফাগুয়া ও তার বেটিকে। অস্থির হয়ে উঠলো মনিরা।

বেশিক্ষণ বিলম্ব করা তার পক্ষে সমীচীন হবে না, তাই মনিরা ছুটলো হরিহরের বাড়ি অভিমুখে, রতন চললো তার সঙ্গে, তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো সে।

মনিরা যখন হরিহরের বাড়ির নিকটে পৌঁছলো তখন তাকে দেখে ফেললো হরিহরের অনুচরগণ। তারা দৌড়ে গিয়ে হরিহরের কানে কানে কথাটা বললো।

শুনবামাত্র হরিহরের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো চক চক্ করে। সে বললো–যা নিয়ে আয় এখানে।

বনহুর বুঝতে পারলে নিশ্চয়ই মনিরা এসেছে এবং সে কথাই হরিহরের অনুচরগণ এসে তাকে জানালো। তাকালো সে সম্মুখের দিকে। হরিহর ইংগিত করলো, ওরা চলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে।

একটু পর ফিরে এলো ওরা, সঙ্গে–হাত-পা মুখ বাধা একটা নারী। তাকে নিয়ে এসে অগ্নিকুটার পাশে নামিয়ে রাখতেই বনহুর বুঝতে পারলো সে যা ভেবেছিলো তাই সত্য। মনিরাকে ওরা পাকড়াও করে এনেছে।

হরিহরের নির্দেশে অনুচরগণ খুলে দিলো মনিরার হাত-পা ও মুখের বাঁধন।

সঙ্গে সঙ্গে মনিরার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো স্বামীর মুখের উপর। মনিরা মুহূর্ত বিলম্ব না করে ছুটে গেলো স্বামীর দিকে কিন্তু এগুতে পারলো না, হরিহর ধরে ফেললো তাকে।

মনিরার হাতখানা শক্ত করে হাতের মুঠায় এটে ধরায় একচুলও এগুতে পারলো না মনিরা, ছিনলতার মত অবস্থা হলো তার।

বনহুর এ দৃশ্য লক্ষ্য করে দাতে দাঁত পিষলো, রাগে চোখ দুটো দিয়ে তার অগ্নিশিখা নির্গত হতে লাগলো।

কিন্তু তার সমস্ত দেহটা মোটা রশি দিয়ে একটা শালবৃক্ষের সঙ্গে শক্ত করে আটকানো ছিলো বলে নীরব থাকতে বাধ্য হলো।

হরিহর যখন মনিরাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিলো, ঐ মুহূর্তে একটা অশ্বপদশব্দ শোনা গেলো এবং সঙ্গে সঙ্গে হরিহরের পিঠে এসে বিদ্ধ হলো একটা তীরফলক।

তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো হরিহর।

সবার চোখেই ফুটে উঠলো বিস্ময়, বিশেষ করে হরিহরের অনুচরগণ ভীষণভাবে ভড়কে গেলো মুহূর্তের মধ্যে।

একজন ছুটে গিয়ে হরিহরকে ধরে ফেললো, তাই হরিহর মাটিতে পড়তে পড়তে তার অনুচরটাকে আঁকড়ে ধরলো।

মনিরা ছাড়া পেয়ে ছুটে গেলো স্বামীর পাশে। স্বামীর বুকে মাথা রেখে বললোতোমাকে ওরা বন্দী করেছে.....।

হা মনিরা!

মনিরা অবাক কণ্ঠে বললোহরিহরকে এভাবে তীরবিদ্ধ করলো কে বুঝতে পারছি না?

আমিও ঠিক কিছু বুঝতে পারছি না কে সে হিতাকাঙ্ক্ষী আমাদের।

মনিরা যখন স্বামীর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাকে প্রশ্ন করছে তখন হরিহরের রক্তাক্ত দেহটা তার অনুচরের কাঁধে তুলে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

ঠিক ঐ সময়ে পুনরায় আর একটা তীর এসে বিদ্ধ হলো হরিহরের সেই অনুচরের পিঠে, যার উপর হরিহর ভর করেছিলো।

সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো অনুচরটা, তারপর হরিহর সহ হুমড়ি খেয়ে পড়লো। রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো শালবনের শুকনো মাটি।

এমন সময় এক অশ্বারোহী প্রবেশ করলো সেখানে। তার দেহে কালো পোশাক, মাথায় ক্যাপ এবং মুখে কালো রুমাল বাধা। চোখ দুটোয় কালো চশমা ধরনের কভার। তার দেহের কোনো অংশ নজরে পড়েছে না বটে তবু সে যে নারী, তার দেহের গঠন দেখে বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

অশ্বারোহী অশ্ব থেকে নামতেই হরিহরের অনুচররা যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো।

তখন হরিহর আর তার অনুচর দিলুরামের রক্তাক্ত দেহ অসাড় হয়ে পড়েছে। স্থির নিস্পন্দ হয়ে গেছে তাদের চোখ দুটো। অশ্বারোহী দ্রুত বনহুরের পাশে গিয়ে কোমরের বেল্ট থেকে ছোরাখানা বের করে ক্ষিপ্ততার সঙ্গে কেটে দিলো তার রশি।

বনহুর মুক্ত হলো বটে কিন্তু সেকিছু বলবার পূর্বেই সেই অশ্বারোহী অশ্বপৃষ্ঠে উঠে পড়লো, তারপর যেমন দ্রুত প্রবেশ করেছিলো তেমনি দ্রুত অদৃশ্য হলো।

মনিরা বা বনহুর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করার অবসর পেলো না। অশ্বারোহী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর নিজের হাতে ফাগুয়া আর রেশমার দেহের রশি খুলে দিলো।

ফাগুয়া আর রেশমার বাঁধন মুক্ত হওয়ায় তারা আনন্দধ্বনি করে উঠলো।

ফাগুয়া জড়িয়ে ধরলো বনহুরকে–বাবুজী, শয়তান সর্দার মরলো, হামরা বাচলাম বাবুজী…শান্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো ফাগুয়া।

রেশমা তখন খুশিতে উচ্ছল, সেদৌড়ে গিয়ে সর্দার হরিহরের মুখে পদাঘাত করলো।

বনহুরের ললাটে ফুটে উঠেছে একটা গভীর চিন্তারেখা। কে এই অশ্বারোহী? তবে কি আশা…কিন্তু আশা কি করে সংবাদ পাবে তাকে এভাবে হরিহর আটক করেছে। তবে কি দুর্গেশ্বরী?…শুনেছিলো বনহুর রাণী দুর্গেশ্বরী কোনো এক নির্জন গুহায় আত্মগোপন করে আছে। সে লোকচক্ষুর অন্তরালে খোকে সাধনা করে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই রাণী দুর্গেশ্বরী তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছিলো। তবে কি সে জানতে পেরেছিলো তার এ সংবাদ…

কি ভাবছো? মনিরা প্রশ্ন করলো!

ভাবছি কে এই অশ্বারোহী! হাঁ, কিন্তু এসব ভাবার সময় এখন নয়, চলো মনিরা এখন ফাগুয়া আর তার মেয়ে রেশমাকে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিই।

মনিরা হরিহর আর দিলুরামের মৃতদেহের দিকে তাকালো, তারপর বললো– পিপীলিকার পাখা হয় মৃত্যুর কারণে। শয়তান হরিহরের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছিলো, তাই সে পিছু লেগেছিলো রেশমা আর ফাগুয়ার।

হা বৌরাণী, তুই ঠিক বলেছিস!

রেশমা বলে উঠলো–বাবুজী, ঐ তীরে কাগজ বাঁধা আছে দেখেছিস?

বনহুরের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো তীরটার পিছন অংশে! সে এতক্ষণ লক্ষ্যই করেনি তীরফলকের পিছন দিকটায়। এবার বনহুর এগিয়ে এলো, তীরটা টেনে তুলে নিলো হরিহরের পাঁজর থেকে।

কাগজখানা খুলে নিয়ে মেলে ধরলো চোখের সামনে, মাত্র দুটি শব্দ

–দস্যুরাণী

বনহুর অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো–এ তীর তাহলে দস্যুরাণী নিক্ষেপ করেছিলো? অশ্বারোহী তাহলে দস্যুরাণী!

মনিরা ততক্ষণে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সেও বলে উঠলোদস্যুরাণী! কে এই দস্যুরাণী?

আমিও তাই ভাবছি! ভাবছি দস্যুরাণী......তবে কি এই সেই দস্যুরাণী! যাক পরে দেখা যাবে। চলো ফাগুয়া, চলো, রেশমা...মনিরা এসো।

বনহুর মনিরা রেশমা ও ফাওয়াকে নিয়ে রওনা দিলো তাদের বাড়ি অভিমুখে।

আজ ফাগুয়ার মুখে হাসি ধরে না।

রেশমাও নিশ্চিন্ত, আর কেউ তাকে পাকড়াও করে নিয়ে যাবে না।

ফাগুয়া আর রেশমাই শুধু খুশি হলো না, খুশি হলো সমস্ত সাঁওতাল নারীপুরুষ। এতদিন হরিহরের অত্যাচারে জর্জরিত ছিলো সবাই, হরিহরের মৃত্যু সাঁওতাল পল্লীতে আনন্দ উৎসব বইয়ে দিলো।

ফাগুয়া উৎসবের আয়োজন করলো।

সন্ধ্যায় যখন সবাই আনন্দ উৎসবে মেতে উঠলো তখন বনহুর আর মনিরাও উৎসবে মেতে উঠেছে। তারা প্রাণ খুলে হাসছে আর হাততালি দিচ্ছে।

শালবন মশালের আলোতে আলোময় হয়ে উঠেছে। আবির ছড়াচ্ছে ওরা এ-ওর গায়ে।

একটা সাঁওতাল তরুণী তার শিশুকন্যাকে নিয়ে আদর করছিলো একপাশে দাঁড়িয়ে।

বনহুরের দৃষ্টি চলে যায় সেইদিকে, তার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠলো ফুল্লরার মুখ। নাসরিন যেন ফুরাকে আদর জানাচ্ছে প্রাণভরে। মনে তার চলে গেলো দূরে বহু দূরে, কান্দাই আস্তানায় নাসরিন আর নূরীর পাশে।

মনিরা স্বামীর মুখোভাব লক্ষ্য করে অবাক হলো, সে বললো–কি হলো হঠাৎ তোমার!

কিছু না।

না, কিছু হয়েছে তোমার। হঠাৎ কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়লে।

মনিরা, এখানে বিলম্ব করা আর আমাদের ঠিক হবে না, কারণ হরিহরের দলের লোক যারা আত্মগোপন করেছিলো তারা আচমকা আক্রমণ চালাতে পারে।

তুমি তো এমন ভীরু ছিলে না কোনোদিনী।

হাসতে চেষ্টা করলো বনহুর কিন্তু সে হাসি ম্লাননিষ্প্রভ মনে হলো মনিরার কাছে। বললো বনহুর এ ভীরুতা আমার জন্য নয়, তোমার জন্য। সত্যি মনিরা, আমি সেই অশ্বারোহিণীকে আন্তরিক ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না, কারণ হরিহরের কবল থেকে সে তোমাকে যেভাবে উদ্ধার করতো তা শুধু বিস্ময়কর নয়, প্রশংসনীয়। জানি না কে সে এবং কি করেই বা সে আমাদের অবস্থা জানতে পেরেছিলো।

মনিরা বললো–সবই সেই দয়াময়ের ইংগিতে সংঘটিত হয়েছে, বুঝলে?

হাঁ, সে কথা নির্ঘাত সত্য।

রেশমা ছুটে আসে–বৌরাণী, তুই আর বাবু এখানে চলে এলি কেন?

ওরা উৎসব–স্থল থেকে কিছুদূর একটা নির্জন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিলো তাই রেশমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তারা। রেশমা এগিয়ে আসে তাদের পাশে এবং প্রশ্ন করে বসে।

রেশমার কথায় বলে উঠে মনিরা–তোমাদের বাবুজী চলে এলো তাই আমিও এলাম। চলো রেশমা, তোমাদের মধ্যে যাই।

মনিরা এগুলো রেশমার সঙ্গে।

বনহুরও তাকে অনুসরণ করলো।

সমস্ত রাত ধরে চললো ওদের আনন্দ উৎসব।

একসময় ভোর হয়ে এলো।

নিদ্রায় জড়িয়ে এলো সাঁওতাল পল্লীর সকলের চোখ।

যে যেখানে পারলো নিদ্রায় ঢলে পড়লো।

মনিরাও স্বামীর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাদের বাসস্থান তক্তার ডাকবাংলো হরিহর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে, তাই আজ তারা আশ্রয়হীন বলা চলে।

কুড়ের এক কোণে গুঁজে রাখা মশালের আলোটাও নিবু নিবু হয়ে এসেছিলো।

বনহুর নিজেও ক্লান্ত অবসন্ন, নিদ্রায় তার চোখ দুটোও মুদে আসছিলো। বেড়ার দেয়ালে বনহুর ঠেস দিয়ে বসেছিলো কতকটা নিশ্চিন্তে। তন্দ্রাভাব এসে গিয়েছিলো তারও।

হঠাৎ তন্দ্রা তার ছুটে যায়, সজাগ হয়ে উঠলো বনহুরকারা যেন তাদের কুটিরের চারপাশ ঘিরে ফেলেছে…কিন্তু তারা কারা?

বনহুর মনিরার মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে রাখলো অতি সন্তর্পণে, তারপর উঠে দাঁড়ালো।

ঐ দন্ডে কুটিরের দরজায় আঘাত পড়লো, যেন ভেঙে ফেলার উপক্রম। সাঁওতাল পল্লী তখন সবে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছিলো। আচমকা জেগে উঠলো সকলে, এমন কি মনিরাও জেগে উঠলো।

বনহুরকে উঠে দাঁড়াতে দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো–ওগো, কি হলো আবার?

ঠোঁটে আংগুল দিয়ে বললো বনহুর–চুপ করো! তারপর চাপা গলায় বললো–নতুন বিপদ!

মনিরা ভয়বিহ্বল কণ্ঠে বললো–নতুন বিপদ?

হাঁ।

কিন্তু কি হয়েছে, দরজায় কারা অমন ধাক্কা দিচ্ছে।

জানি না। বনহুর দরজা খুলে দেবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়াতেই মনিরা স্বামীর হাতখানা ধরে ফেলে।

মনিরা বলে–তুমি যেও না।

দরজা খুলে না দিলে এক্ষুণি ভেঙে ফেলবে।

ঠিক ঐ সময় বাইরে শোনা যায় ফাগুয়ার গলা এবং বেড়ার ফাঁকে দেখা যায় মশালের আলো ফাগুয়া বলছে–ডাক্তার তুই……মশাল উঁচু করে ধরেছে ফাগুয়া।

অপর গলা–হা আমি। বলো কোথায় তোমাদের সেই বাবুজী?

আমি বলবো না। তুই পুলিশ ফোর্স নিয়ে বাবুজীকে পাকড়াও করতে এসেছিস ডাক্তার?

ডাক্তারের গলা–হা, তোমাদের বাবুজীকে পাকড়াও করতে এসেছি। বলো সে কোথায়?

ফাগুয়ার গলা–বাবুজী কি অপরাধ করেছে তাই তাকে পুলিশ ফোর্স নিয়ে পাকড়াও করতে এসেছিস?

ডাক্তারের গলা নয়, এবার অপর একটা গলার স্বরজানো সে সেই বাবুজী–সে দস্যু বনহুর।

ফাগুয়ার গলা–না না, বাবুজী দস্যু বনহুর না! বাবুজী খুব ভাল লোক……

কিন্তু ততক্ষণে বনহুর দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে।

অবশ্য মনিরার শত বাধা উপেক্ষা করে বনহুর বেরিয়ে এলো কুটিরের বাইরে।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ফোর্স বনহুরকে ঘিরে ধরলো।

মনিরা বনহুরের ডান হাতখানা বলিষ্ঠ মুঠায় চেপে ধরে আছে। সে ভেবে পাছে না হঠাৎ একি বিভ্রাট ঘটে গেলো।

ততক্ষণে রেশমা ও ফাগুয়ার বৌ বেরিয়ে এসেছে।

তারাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

কিন্তু রেশমা সজাগ হয়ে উঠলো, সে বুঝতে পারলো বাবুকে পুলিশ বাহিনী গ্রেপ্তার করেছে। সে মনে করলো হরিহর আর দিলুরামের হত্যাব্যাপারে পুলিশ বাহিনী এখানে এসেছে এবং বাবুকে ঘিরে ফেলেছে।

রেশমা ছুটে গিয়ে দাঁড়ালো বাবুজী আর বৌরাণীর সম্মুখে, কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো বাবুজীর কোনো দোষ নেই, বাবুজী বহু ভাল। হরিহর হামাদের খুব খারাবি করেছে, তাই…….

কিন্তু রেশমার কথা শেষ হয় না, পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ রহমান চিৎকার করে উঠে–মাসুমা মা তুই…তিনি ছুটে গিয়ে রেশমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

রেশমার দু’চোখে বিস্ময় ফুটে উঠে।

অন্য সকলে অবাক!

বনহুর ঠিক ঐ মুহূর্তে এক লাফ দিয়ে পুলিশ বুহ্য ভেদে করে বেরিয়ে আসে এবং একটা পুলিশ ভ্যানে চেপে বসে দ্রুতগতিতে, তারপর সে গাড়িতে স্টার্ট দেয়।

রাত তখন ভোর হয়ে এসেছে।

গাড়িখানা পাহাড়িয়া পথ ধরে উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো।

পুলিশ বাহিনী ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে পড়েছিলো ক্ষণিকের জন্য। তারা মিঃ রহমানের আদেশের প্রতীক্ষায় ছিলো।

মিঃ রহমান তখন রেশমাকে নিয়ে আত্নহারা, বহুদিন পর তিনি তার হারানো কন্যাকে ফিরে পেয়েছেন। তাই তিনি ভুলে গেছেন কর্তব্যের কথা। তিনি যে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য এই জঙ্গলে এসেছেন। তা বিস্ময় হয়ে গেলেন।

মিঃ রহমান যতই রেশমাকে মাসুমা বলে ডাকছেন ততই রেশমা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পাওয়াকে আঁকড়ে ধরছে। সে ভেবে পাচ্ছে না এ অভদ্রলোক তাকে এভাবে মাসুমা–মাসুমা বলে ডাকছেন কেন।

মিঃ রহমান রেশমাকে দেখামাত্র চিনতে পারেন, কারণ রেশমার বয়স বাড়লেও তার চেহারার তেমন পরিবর্তন হয় নি, বরং সে ঠিক তার মায়ের মত দেখতে হয়েছে। একেবারে হুবহু সেই মুখ। রহমান সাহেব এতদিন পর তার নয়নমনি কন্যাকে ফিরে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ ফিরে পেয়েছেন।

যদিও তিনি এখনও একেবারে সঠিক জানতে পারেন নি যে এই মেয়েটিই তার সেই হারানো মাসুমা কিনা।

পিতার মন হঠাৎ আত্নহারা হয়ে পড়েছিলো, পুলিশ বাহিনী যখন বললো–স্যার, দস্যু বনহুর আমাদের পুলিশ ভ্যান নিয়ে পালালো, আমরা কি তার পিছু নেবো?

সম্বিৎ ফিরে পেলেন মিঃ রহমান, তিনি বলে উঠলেনাও, যাও তাকে পাকড়াও করো। পালাতে যেন না পারে সে……।

ডাক্তার বলে উঠলেন–গাড়ির চাকা লক্ষ্য করে গুলী ছোড়, না হলে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে না।

আদেশ পাওয়া মাত্র পুলিশ বাহিনী এক এক ভ্যানে চেপে বসলো এবং সম্মুখের ভ্যানটিকে ফলো করলো।

পাথুরিয়া পথ।

তাছাড়াও ঝোপঝাড় আগাছায় ভরা। দু’পাশে শালবন, বনহুরের হাতে গাড়িখানা উলকাবেগে ছুটে চলেছে।

পিছনে ছুটছে সশস্ত্র পুলিশ ফোর্স।

মনিরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে, সে থ মেরে গেছে–একি হলো, আচম্বিতে মাথায় বজ্রাঘাত হলো যেন। মনিরা কি করবে ভেবে পাচ্ছে না, দিশেহারার মত তাকাচ্ছে চারদিকে। মনপ্রাণে সে খোদাকে স্মরণ করছিলো, হে খোদা দয়াময়, তুমি বাঁচিয়ে নাও ওকে, মনে মনে শিউরে উঠে মনিরা, সে ভাবতেও পারেনি হঠাৎ এমন অঘটন ঘটবে।

বনহুরকে অনুসরণ করে পুলিশ ফোর্স ততক্ষণে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। শালবনের আড়ালে অনেকদূর এগিয়ে গেছে তারা।

মাঝেমাঝে গুলীর শব্দ ভেসে আসছে।

পুলিশ বাহিনী বনহুরের ভ্যান লক্ষ্য করে গুলী ছুড়ছে–এ শব্দ তারই। মনিরার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছিলো, না জানি কি অবস্থার সম্মুখীন হলো সে।

এদিকে মিঃ রহমান তখন রেশমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকছেন–আমার কোন ভুল হয় নি, আমি ঠিক চিনতে পেরেছি তুই আমার মেয়ে। তুই আমার মেয়ে,

রেশমার চোখে ফুটে উঠেছে একটা ভীত আতঙ্কিত ভাব, সে ফাগুয়াকে জড়িয়ে ধরে বলছে–না না, হামার বাপু ফাগুয়া…হামার বাপু ফাগুয়া। হামি তোর বেটি নই….

মিঃ রহমান যেন কেমন হয়ে পড়েছেন, তিনি কিছুতেই রেশমাকে ছেড়ে দিচ্ছে না। বারবার রেশমাকে কাছে টেনে নিতে চেষ্টা করছেন।

ফাগুয়া আর চেপে থাকতে পারলো না, এতক্ষণ সে নীরব ছিলো, এবার বললো–সাহেব রেশমাকে হামি কুড়িয়ে পাইয়াছিলাম। সে আমার মাইয়্যা নয় তাকে হামি কুড়িয়ে পাইয়াছি। সাহেব বল তোর মাইয়্যা কোথায় হারাইয়াছিলো বল্ হামি শুনতে চাই বল্ সাহেব, আমি শুনতে চাই?

মিঃ রহমান বললেন–সে আজ প্রায় বারো বছর আগের কথা।

বল্ বল সাহেব, তারপর?

কিন্তু এখন আমি সব কথা বলতে পারছি না। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত আমি স্থির হতে পারছি না। তুমি আমাকে কথা দাও আমার সঙ্গে শহরে যাবে এবং আমার সব কথা শুনবে আর তোমার সব কথা আমাকে বলবে? আমি ঠিক চিনতে পেরেছি এই সেই মাসুমা–আমার হৃদয়ের ধন, নয়নের মনি…

সাহেব তুই বাবুজীকে ধরিস না, বাবুজী খুব ভাল। সে আমাকে একবার নয় দু'বার নয় ক'বার বাঁচাইছে।

বলে উঠে রেশমা–শুধু বাপু তোর জান বাঁচায় নি আমার জান বাঁচাইছে, হামার ইজ্জত বাঁচাইছে…সাহেব বাবুজীকে তোরা ধরিস না! বল বল সাহেব বাবুজীকে ধরবি না? বাবুজী বড় ভাল মানুষ, ঐ তত বৌরাণী সেও হামাদের কত দরদ করে।

ডাক্তার এতক্ষণ চুপ করেছিলেন, তিনি বললেন–হাঁ, ইন্সপেক্টার, এই মহিলা দস্যু বনহুরের স্ত্রী।

ইন্সপেক্টার মিঃ রহমান তাকালেন মনিরার দিকে। দেখলেন এক তেজোদ্দীপ্ত অনিন্দ্যসুন্দরী নারীমূর্তি। যদিও তিনি ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছিলেন মনিরাকে কিন্তু খুব ভালভাবে খেয়াল করেন নি। এবার বিস্মিত নয়নে তাকালেন মিঃ রহমান, মনে মনে ভাবলেন এই নারী দস্যু বনহুরের স্ত্রী, আশ্চর্য বটে!

মনিরা এগিয়ে আসে মিঃ রহমানের পাশে, তারপর কোমল কণ্ঠে বলে মনিরা–আমার বিশ্বাস রেশমা আপনার কন্যা, কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার চেহারার সঙ্গে ওর চেহারার যথেষ্ট মিল আছে। আর রেশমা যদি সত্যিই আপনার কন্যা বলে প্রমাণিত হয় তাহলে বনহুর ওর যে উপকার করেছে তা সত্যি ওর জীবনে এক মহা সম্পদ। তাই আপনার কন্যার ইজ্জত রক্ষা স্বরূপ আপনি বনহুরকে গ্রেপ্তার থেকে ক্ষান্ত হোন।

মনিরার কথায় মিঃ রহমানের চোখ দুটো কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে আসে, মুখমন্ডলে ফুটে উঠলো একটা করুণ ভাব, তাকালেন তিনি ডাক্তারের মুখের দিকে।

ডাক্তার বনহুরকে দেখার পর থেকেই তার মনে জেগেছিলো একটা প্রশ্ন, কে এই ভদ্রলোক যার আচরণ, চেহারা সাধারণ মানুষের মত নয়। যাকে অসাধারণ বলে মনে হয়েছিলো তার কাছে এবং সেই অসাধারণ ব্যক্তিটিকে নিয়ে তার মাথার মধ্যে নানা রকম চিন্তার উদ্ভব হচ্ছিলো। তাই তিনি বলেছিলেন কথাটা তার এক পুলিশ অফিসার বন্ধুর কাছে।

তিনি শুনেই চমকে উঠেছিলেন এবং তার মনে উদয় হয়েছিলো একটা অসাধারণ ব্যক্তির কথা সে হলো দস্যু বনহুর। ডাক্তারের কথার সঙ্গে মিলে গিয়েছিলো তার চিন্তাশক্তি।

পুলিশ অফিসারটি জানিয়ে দিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর মিঃ রহমানকে।

মিঃ রহমানের মাথার মধ্যে একটা বিরাট চিন্তা বহুদিন থেকে দানা বেঁধে ছিলো, সে হলো দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার। যে দস্যু বনহুরকে নিয়ে কান্দাই বাসীর চিন্তার অন্ত ছিলো না। যাকে গ্রেপ্তার করতে পারলে পাবেন দু'লক্ষ টাকা। দু'লক্ষ টাকার অধিকারী হলে যাবে কয়েক পুরুষ। এমন সুযোগ কে ছাড়তে চায়?

মিঃ রহমান পুলিশ প্রধানকে জানালেন এবং নিজে গোপনে সন্ধান নিলেন। সন্ধান নেবার পর তিনি বুঝতে পারলেন যা ভেবেছিলেন সত্য এবং মিঃ রহমান পুলিশ বাহিনীর সাহায্য চাইলেন পুলিশ প্রধানের কাছে।

পুলিশ প্রধান সদা প্রস্তুত ছিলেন এ ব্যাপারে। তিনি মিঃ রহমানকে পুলিশ বাহিনী দিয়ে সাহায্য করবেন বলে জানালেন।

মিঃ রহমান নিজে প্রস্তুত হলেন এবং ডাক্তারকে পথপ্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে নিয়ে বনহুরকে গ্রেপ্তারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

যাক্তার যখন জানতে পারলেন তিনিই দস্যু বনহুরকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছেন তখন তার খুশি আর ধরে না। তিনি জানেন দস্যু বনহুরকে যদি পুলিশবাহিনী গ্রেপ্তার করতে পারেন বা তার সন্ধানেই দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হয়

তাহলে প্রচুর অর্থ পাবেন। অবশ্য মিঃ রহমান এবং ডাক্তার উভয়ই এ অর্থের সমানাভাবে অধিকারী।

এখানে এ ধরনের কথা শুনে ডাক্তারের মুখমন্ডল বিমর্ষ মলিন হলো। মিঃ রহমান হঠাৎ একটা সাঁওতাল মেয়েকে দেখে এমনভাবে তার হারানো কন্যাকে স্মরণ করবেন তা ভাবতে পারেন নি। এখন তিনি গম্ভীর হয়ে পড়লেন। মিঃ রহমান যাতে সাঁওতাল কন্যাটির দিকে আকৃষ্ট না হন, এজন্য তিনি বললেন–মিঃ রহমান, একটা সাঁওতাল কন্যা কিছুতেই আপনার নিজ কন্যা হতে পারে না, নিশ্চয়ই এই মেয়েটি আপনার মেয়ের মত দেখতে, এই যা। আপনি কোনো কথা না শুনে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে আত্মনিয়োগ করুন মিঃ রহমান।

মনিরা বলে উঠলো–ডক্টর, আপনি এতো হৃদয়হীন? বনহুর দস্যু হতে পারে কিন্তু সে হৃদয়হীন নয়। সে কারও ক্ষতি করে না, আপনারও কোনো ক্ষতি সাধন করেনি বলেই আমি জানি।

ডাক্তার বলে উঠলেন–দস্যু বনহুর যে কারও ক্ষতি সাধন করেনি বা করে না একথা কেউ বিশ্বাস করবে না, যদিও সে আমার কোনো ক্ষতি সাধন করেনি।

তবে কেন আপনি তার পিছনে পুলিশ বাহিনীকে লেলিয়ে দিলেন? বলুন কেন? পুরস্কারের লোভে বলুন কত টাকা আপনি চান? দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার ব্যাপারে দু'লক্ষ টাকা ঘোষণা করা আছে, আমি আপনাকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেবো, না হয় পাঁচ লক্ষ টাকার সামগ্রী দেবো।

ডাক্তারের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো মহামূল্যবান সামগ্রীর লোভে। কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি কিছু বললেন না, কারণ মিঃ রহমান তখন পাশে দন্ডায়মান।

মনিরা ডাক্তারের মুখোভাব লক্ষ্য করে বুঝতে পারলো ওষুধ কাজে লেগেছে। আর কিছুটা বাড়াতে পারলেই ডাক্তার নরম হয়ে আসবে। মনিরা এবার মিঃ রহমানকে লক্ষ্য করে বললো–আমি জানি রেশমাকে ফাগুয়া কুড়িয়ে পেয়েছিলো এবং তাকে সে নিজ কন্যার মতই লালন–পালন করেছে। ইন্সপেক্টার, আপনি ফাগুয়ার কাছে ওকে কুড়িয়ে পাওয়ার ঘটনাটা মনোযোগ সহকারে শুনুন।

হাঁ, তাই শুনবো–আমার হারানো মা মনিকে আমি ফিরিয়ে পেয়েছি...না না, আমি ভুল করিনি, আমি ভুল করিনি। মিঃ রহমান রেশমার হাত দু'খানা মুঠায়

চেপে ধরলেন।

ডাক্তার সেই ফাঁকে মনিরার দিকে ঝুঁকে এলেন এবং বললেন–দেখুন আমি এক্ষুণি মিঃ রহমানকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ বাহিনী সহ ফেরৎ যাবে যদি আপনি আমাকে দু'লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হন?

মনিরা বললো–নিশ্চয়ই আমি এ টাকা আপনাকে দেবো–এবং কেউ জানবে না।

হাঁ, তাহলে আমি রাজি আছি।

ডাক্তারের চোখ দুটো দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

ঠিক ঐ মূহর্তে পুলিশ ভ্যানগুলো ফিরে এলো কর্কশ শব্দ করে।

অবাক হলেন ডাক্তার এবং মিঃ রহমান। তারা উভয়ে তাকালেন সম্মুখে।

ততক্ষণে পুলিশ ভ্যান থেকে নেমে এসেছে পুলিশ বাহিনী। তাদের মুখ কালো, পরাজয়ের গ্লানিতে ম্লান।

মিঃ রহমান বললেন–কি হলো, তোমরা দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে সক্ষম হওনি?

মাথা নত করে বললো একজন–না স্যার, আমরা তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই নি।

বললেন মিঃ রহমান–কেন, কেন দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে সক্ষম হলে না তোমরা?

একজন পুলিশ কুর্ণিশ জানিয়ে বললো–হুজুর, আমরা ঠিকই বনহুরের গাড়িখানাকে অনুসরণ করে ছুটছিলাম এবং ভ্যানখানাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ছিলাম কিন্তু.......

বলো, থামলে কেন, কিন্তু কি বললেন মিঃ রহমান।

পুলিশটা বললো–বিস্ময়কর ব্যাপার, আমরা ভ্যান নিয়ে বনহুরের ভ্যানখানাকে অনুসরণ করে যতদূর সম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে এগুচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে আমরা

বনহুরের ভ্যানখানার প্রায় নিকটবর্তী হচ্ছিলাম এবং ভ্যানের চাকা লক্ষ্য করে গুলী ছুড়ছিলাম। হুজুর, সম্মুখে বিরাট একটা খাদ ছিলো, আমরা মনে করলাম ঐ খাদ পেরিয়ে বনহুর পালাতে সক্ষম হবে না, এবার আমরা তাকে সশরীরে গ্রেপ্তার করতে পারবো। হুজুর, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না.......

কি হয়েছে বলো?

মনিরা স্তব্ধ নিঃশ্বাসে পুলিশটার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনছিলো। আর মনে মনে স্মরণ করছিলো–হে রহমানুর রহিম, তুমি ওকে বাঁচিয়ে নিও....

রেশমাও অন্তরে অন্তরে ঈশ্বরের নাম নিচ্ছিলো যেন বাবুজীর কোনো অমঙ্গল না হয়। বাবুজীকে রেশমা শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, সে শুধু তার বাপুকেই বাঁচায়নি রক্ষা করেছে তার ইজ্জত.......

ফাগুয়াও মনে মনে বাবুজীর মঙ্গল কামনা করছিলো, তাই সেও মনোযোগ সহকারে শুনছিলো পুলিশটির কথাগুলো।

মিঃ রহমান দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে এসে তার হারানো কন্যাকে ফিরে পেয়ে আত্নহারা হয়ে পড়েছিলেন। কতকটা আত্নবিস্মৃত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। পুলিশ বাহিনী যখন ফিরে এসে সংবাদ জানালো দস্যু বনহুরকে তারা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় নি, তখন সম্বিৎ ফিরে এলো তার।

পুলিশটা বলে চললো–জুর, কাঁদটা দেখে আমরা আশ্বস্ত হয়েছিলাম নিশ্চয়ই বনহুর ভ্যানসহ থেমে পড়বে কিন্তু.......।

কিন্তু কি বলো, অমন শুধু কিন্তু কিন্তু করছো কেন?

হুজুর দস্যু বনহুরের ভ্যানখানা মুহূর্তের জন্য থেমে পড়লো–তারপর পিছনে হটে এলো খানিকটা মনে করলাম বনহুর সম্মুখে বিপদ দেখে ভড়কে গেছে কিন্তু আশ্চর্য, বনহুর ভ্যান সহ উল্কার মত খাদ লক্ষ্য করে গাড়ি ছুটালো। বিস্ময়কর দৃশ্য হুজুর, ভ্যানখানা লাফিয়ে পড়লো খাদের দিকে। আমরা চোখ বন্ধ করলাম কিন্তু বনহুরের ভ্যানখানা খাদের মধ্যে পড়ে যায়নি, ভ্যানখানা খাদের ওপারে গিয়ে পড়েছে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলো।

এবার ডাক্তার দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন–খুব শুভ সংবাদ দিচ্ছ তোমরা। এতগুলো সশস্ত্র পুলিশ হয়েও তোমরা একজনকে গ্রেপ্তার করতে পারলে না? যাক, যা হবার হয়েছে, এবার ফিরে যেতে হবে। মিঃ রহমান চলুন, এখানে বিলম্ব করে আর কোনো ফল হবে না। তাছাড়া নতুন কোনো বিপদ আসতে পারে।

মিঃ রহমান বললেন–যতক্ষণ না আমি ঐ সাঁওতাল বৃদ্ধের মুখে আমার কন্যার কুড়িয়ে যাওয়ার সম্বন্ধে সবকিছু জানতে পেরেছি ততক্ষণ আমি ফিরে যেতে পারি না। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার সার্থক হলো না, এজন্য আমি দুঃখিত কিন্তু আমি যদি আমার হৃদয়ের ধন নয়নের মণি মাসুমাকে ফিরে পাই তাহলে আমি আমার হারানো রত্ন ফিরে পাবো........মা মাগো, আমার মাসুমা! তাকালেন তিনি রেশমার মুখের দিকে।

রেশমার মুখে ফুটে উঠেছে একটা ভীতিভাব, সে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে ফাগুয়ার পাশে।

মিঃ রহমান ফাগুয়াকে লক্ষ্য করে বললেন–বলল, বলল তুমি কোথায় পেয়েছিলে আমার হারিয়ে যাওয়া রত্নটাকে?

ফাগুয়া না বলে পারলো না, তার মাথার মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা আলোড়ন তুলেছিলো। রেশমাকে এতদিন পাওয়া নিজের মেয়ের মত করে লালন পালন করলেও সদাসর্বদা তার অন্তরের মধ্যে একটা যন্ত্রণা তাকে পীড়া দিচ্ছিলো, না জানি এই মেয়েটি কার–কার নয়নের মনি হৃদয়ের ধন! ফাগুয়া নিজে নিঃসন্তান ছিলো কিন্তু সন্তানের প্রতি পিতামাতার যে একটা অপরিসীম স্নেহ মায়া মমতা আছে তা সে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে আর করতো বলেই তার মনে এত ব্যথা জাগতো রেশমার সত্যিকারের বাবা–মার জন্য। এতদিন পর যদিও কন্যাকে হারানো ব্যথা তাকে অস্থির করে তুলছিলো তবু সে সত্য কথা বলতে আগ্রহী হলো। এগিয়ে এলো ফাগুয়া বলার জন্য মিঃ রহমানের পাশে।

কিন্তু ডাক্তার দেখলেন সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যেতে বসেছে, দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হলো না, দু'লক্ষ টাকা তার হাতের মুঠা থেকে খসে পড়লো, এতবড় একটা সুযোগ তার বিফলে যাবে এটা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না, তাই তিনি নতুন এক বুদ্ধি আঁটলেন, বললেন ইন্সপেক্টার, দস্যু বনহুরকে আপনারা গ্রেপ্তার করতে না পারলেও আপনারা তার সহধর্মিনীকে হাতের মুঠায় পেয়েছেন। তাকেই আটক করে নিয়ে চলুন। তাহলেই দস্যু বনহুর ধরা দিতে বাধ্য হবে।

মিঃ রহমান ভাবলেন কথাটা মন্দ নয়, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে এসে যদি কন্যা লাভ হয় এবং দস্যু বনহুরের সহধর্মিনীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে সক্ষম হন তাহলে তাদের শ্রম ব্যর্থ হবে না। বললেন মিঃ রহমান–তাই ভাল ডাক্তার, আপনি যা বলেছেন সেইমতই কাজ করবো।

মনিরা ভীত না হলেও কিছুটা বিচলিত এবং চিন্তিত হলো, কারণ ডাক্তারের কথাগুলো সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলো। মনিরা এখন অসহায়, তার কিই বা করবার আছে আর কিইবা করবে সে, তাই নীরব রইলো। মনিরা ভাবছে যত বিপদই আসুক মাথা পেতে গ্রহণ করবে সে, তার সান্ত্বনা স্বামীকে পুলিশ বাহিনী গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবে না–হয় নি। এ বিপদ তার কাছে তেমন কঠিন নয় বিপদ আসতো যদি সে গ্রেপ্তার হতে পুলিশ বাহিনীর কাছে।

ভাবতে ভাবতে মনিরার হৃদয় অনাবিল আনন্দে ভরে উঠলো, বললো সে–বলুন কোথায় যেতে হবে নিয়ে চলুন সেখানে।

মিঃ রহমান এবং পুলিশ বাহিনী মনিরার কথা শুনে অবাক হলো। এমনভাবে নিজ মুখে কেউ কোনোদিন বলেনি যে, আমাকে নিয়ে চলুন কোথায় যেতে হবে সেখানে, কারণ দস্যুপত্নীকে পুলিশ বাহিনী বিনা কারণে নিয়ে যাচ্ছে না, এটা সত্য। তাকে বন্দীশালায় আটক রেখে বনহুরকে গ্রেপ্তার করার সুযোগ নেবো।

তবু মনিরার মুখমন্ডল উজ্জ্বল দীপ্ত, এতটুকু চিন্তার ছাপ পড়লো না তার মুখে।

মিঃ রহমান ফাগুয়াকে লক্ষ্য করে বললেন–বৃদ্ধ, তোমাকেও যেতে হবে আমাদের সঙ্গে, কারণ আমি মাসুমার সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চাই তোমার মুখে।

ফাগুয়া সরল সহজ মানুষ, বললো–আচ্ছা বাবুজী, তুই যা বলবি তাই করবো কিন্তু একটা কথা আমি বলছি তোকে শুনতে হবে?

বললেন মিঃ রহমান–আচ্ছা শুনবো।

বৌরাণীকে তোরা আটক করবি না।

ডাক্তার বলে উঠলেন–আচ্ছা তা দেখা যাবে। মিঃ রহমান, আর বিলম্ব করা ঠিক হবে না, কারণ দস্যু বনহুরকে যখন আটক করা সম্ভব হলো না তখন সে

নিশ্চয়ই কোনো রকম গোলযোগ বাঁধাতে পারে, কাজেই যত তাড়াতাড়ি এ স্থান ত্যাগ করা যায় তাই শ্রেয়।

মিঃ রহমান ভেবে দেখলেন ডাক্তার যা বললেন তা অহেতুক নয় বরং নির্ঘাত সত্য। দস্যু বনহুরকে তারা পাকড়াও করতে পারেন নি, নিশ্চয়ই সে হঠাৎ কিছু করে বসতে পারে। তার অসাধ্য কিছু নেই।

মিঃ রহমান পুলিশ বাহিনীসহ ফাগুয়া আর রেশমাকে গাড়িতে উঠে বসার নির্দেশ দিলেন। মনিরাকে নিলেন তাদের নিজেদের গাড়িতে।

রেশমাকে যখন ফাগুয়া বললো–চল মা রেশমা চল তোর বাবা–মার কাছে তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি, তখন রেশমা কেঁদে আকুল হলো। ফাগুয়ার বৌয়ের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো রেশমা।

তবু তাকে যেতে হলো, না গিয়ে কোনো উপায় ছিলো না তার। গাড়িতে চেপে বসবার আগে বললো–মা তোকে ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারবো না, আবার হামি চলে আসবো।

ফাগুয়ার বৌও কাঁদতে লাগলো।

গাড়িগুলো শালবন অতিক্রম করে এগিয়ে চললো।

মনিরার মনে নানা চিন্তার উদ্ভব হচ্ছিলো। না জানি তার ভাগ্যে কি আছে কে জানে। তার স্বামী পুলিশদের গাড়ি নিয়ে চলে গেছে। খোদা তার সহায় ছিলো, তাই সে রক্ষা পেয়েছে। আরও কত কি ভাবছে মনিরা কত কথা! কদিন কি আনন্দেই না কেটেছে। স্বামীকে এমন করে কোনোদিন সে কাছে পায়নি যেমন করে সে পেয়েছিলো এ ক'দিন। অভূতপূর্ব অনুভূতিতে ভরে উঠেছিলো তার অন্তর, স্বামীর সঙ্গ যে এত মধুর তা সে এমন করে উপলব্ধি করতে পারেনি কোনোদিন। মনিরার সব হাসি আনন্দ যেন মুহূর্তে উবে গেলো কর্পূরের মত।

পুলিশ ভ্যানগুলো চলেছে।

শালবন অতিক্রম করে পাহাড়িয়া পথ ধরে গাড়িগুলো এগুতে লাগলো। দু'পাশ ঘর জঙ্গল, কোথাও বা বিস্তৃত প্রান্তর, কোথাও শুধু মরুভূমির মত বালুকারাশির স্তূপ।

কয়েকখানা পুলিশ ভ্যান নিয়ে তারা এসেছিলো কিন্তু ফিরবার পথে একখানা হারিয়েছে। দস্যু বনহুর সেই গাড়িখানা নিয়েই তাদের লক্ষ্যের বাইরে চলে যেতে সক্ষম হয়েছে।

গাড়িগুলো যখন শালবন ও পাহাড়িয়া অঞ্চল এবং প্রান্তর অতিক্রম করে জঙ্গলের কাছাকাছি পৌঁছেছে, তখন হঠাৎ একটা গুলী এসে বিদ্ধ হলো যে গাড়িতে ছিলো মনিরা সেই গাড়ির পিছন চাকায়। গাড়িখানা আপনা আপনি থেমে পড়লো একটা শব্দ করে।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য গাড়িগুলোও থেমে পড়লো এবং পুলিশ বাহিনীও রাইফেল উদ্যত করে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারই মধ্যে জমকালো পোশাকপরা জমকালো অশ্বারোহী এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো পুলিশ বাহিনীর উপর।

সবার হাতেই অস্ত্র তবু কেউ গুলী ছুঁড়তে পারলো না, চোখের নিমিশে জমকালো মূর্তি একজনের হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নিয়ে ভীষণভাবে আক্রমণ চালালো। জমকালো মূর্তি রাইফেল থেকে গুলী ছুড়লো না, শুধু প্রহার করে চললো। রাইফেলের আঘাতে এক একজন ছিটকে পড়লো দূরে। কেউ বা গাড়ির মধ্যে উবু হয়ে পড়লো হুমড়ি খেয়ে। কেউ সঠিকভাবে গুলী ছুঁড়তে পারছে না, কারণ গুলী ছুড়লে এসে বিদ্ধ হবে যে কোনো পুলিশ কিংবা পুলিশ অফিসারের শরীরে।

আচমকা আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পুলিশ বাহিনী এবং ডাক্তার ও ইন্সপেক্টার মিঃ রহমান। ফাগুয়া আর রেশমাও কম অবাক হয় নি, তারা হতবাক হয়ে পড়েছে।

শুধু মনিরা হতবাক বিস্মিত হয় নি, কারণ সে জানে বা বুঝতে পেরেছে জমকালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি কে। তবে কিছুটা যে অবাক হয়নি তা নয়, ভাবছে মনিরা কি করে তার স্বামী তাজকে পেলো আর কি করেই বা সে এখানে উপস্থিত হলো! মনেপ্রাণে মনিরা খোদাকে স্মরণ করছিলো, হয়তো এটা খোদার রহম বলা যায়।

আনন্দে ভরে উঠেছে মনিরার মন কিন্তু ভয় হচ্ছে, তার কারণা পুলিশ বাহিনী সংখ্যায় অনেক আর বনহুর একা–তা ছাড়াও পুলিশ বাহিনীর হাতে আছে গুলীভরা রাইফেল।

বনহুর যে একা এতগুলো পুলিশের সঙ্গে লড়ছে সত্যি বিস্ময়কর। অদূরে তাজ দাঁড়িয়ে আছে, মাঝে মাঝে সে সম্মুখের পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করছিলো। হয়তো বা প্রভুর ক্রুদ্ধ অবস্থা তাকে আরও উত্তেজিত করে তুলছিলো। সেও লড়াইয়ের জন্য কাউকে আহ্বান জানাচ্ছিলো, মনোভাব এসো আমার সঙ্গে কে লড়বে এসো। শুধু সে মাটিতে পা দিয়ে আঘাতই করছিলো না, মাঝে মাঝে চিঁহি চিহি শব্দও করছিলো।

কিন্তু পুলিশ বাহিনীর তখন সেদিকে লক্ষ্য করার সময় নেই। তারা তখন নিজ নিজ কর্তব্য পালনে ব্যস্ত। তাদের সবার লক্ষ্য জমকালো মূর্তি, গুলী ছুঁড়বার জন্য সবাই প্রস্তুত হয়ে আছে কিন্তু কেউ গুলী ছড়তে পারছে না বা সাহসী হচ্ছে না, কারণ গুলী লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে নিজেদের দেহে বিদ্ধ হবে।

মিঃ রহমানও রিভলভার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নিজ গাড়ির মধ্যে, কিন্তু গুলী ছুড়বার সুযোগ পাচ্ছেন না। গুলী ছুড়লে তার বাহিনীর যে কোনো পুলিশের দেহে গুলী বিদ্ধ হতে পারে। এ কারণে তিনি নীরব থাকতে বাধ্য হচ্ছেন, তবে বেশিক্ষণ প্রতীক্ষা করার ব্যক্তি তিনি নন। মিঃ রহমান এবং ডাক্তার বুঝতে পেরেছেন, এই ব্যক্তি সাধারণ ব্যক্তি নয়, নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর হবে।

মিঃ রহমান নিজেও আক্রমণ করলেন বনহুরকে। পিছনে থেকে জাপটে ধরলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার চেপে ধরলেন বনহুরের পিঠে।

বনহুর ফিরে দাঁড়িয়ে দু'হাত উঁচু করে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে মনিরার মুখ কালো হয়ে উঠলো। সে ভাবতেও পারেনি এমনভাবে তার স্বামী পরাজয় বরণ করবে।

পুলিশ বাহিনী রাইফেল উদ্যত করে ঘিরে ফেললো বনহুরকে। বনহুরের মুখের কালো রুমালখানা ডাক্তার সরিয়ে ফেললেন টান দিয়ে। অমনি একটা সুন্দরী দীপ্ত বলিষ্ঠ মুখ বেরিয়ে এলো।

রেশমা মনিরার পাশে এসে স্তব্ধ নিঃশ্বাসে দেখছিলো এই কান্ড কারখানা। ফাগুয়াও তাই–কারণ তারা কেউ বুঝতে পারেনি জমকালো পোশাকপরা ব্যক্তি কে।

এক্ষণে রেশমা অস্ফুটধ্বনি করে উঠলো–বাবুজী তুই.......

সেই মুহূর্তে পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ রহমান একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন, তিনি ফিরে তাকান রেশমার দিকে।

বনহুর সেই সুযোগের সত্ত্যবহার করে, সে মুহূর্তে মনিরার গাড়ির মধ্যে লাফিয়ে পড়ে এবং মনিরাকে তুলে নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে উঠে বসে।

সঙ্গে সঙ্গে তাজ উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো।

একসঙ্গে পুলিশ বাহিনী গুলী ছুড়লো তাজ ও বনহুরকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু তাজ সহ বনহুর তখন পুলিশ বাহিনীর রাইফেলের লক্ষ্যের বাইরে চলে গেছে। হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন মিঃ রহমান এবং ডাক্তার। তাদের চক্ষুস্থির, এমন হবে তারা ভাবতেও পারেন নি।

ফাগুয়া আর রেশমাও থ' মেরে গেছে, বাবুজী কোথা থেকে এমনভাবে এসে হাজির হলেন ভাবতেও পারছে না তারা।

রেশমা ফাগুয়াকে লক্ষ্য করে বললো–বাবুজী বৌরাণীকে নিয়ে চলে গেলো?

হা রেশমা সেই ভাল হলো! বললো ফাগুয়া।

মিঃ রহমান ও পুলিশ বাহিনী কিছুক্ষণের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেও তারা বেশিক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে রইলেন না। বললেন মিঃ রহমানযা ঘটবার ঘটে গেলো, এবার ফিরে চলো সবাই।

ফিরে না গিয়েই বা কি লাভ হবে, কাজেই পুলিশ বাহিনী সবাই গাড়িতে উঠে বসলো।

ফাগুয়া আর রেশমা প্রথমে যেতে চাইলো না কিন্তু মিঃ রহমানের নির্দেশে এবং আদেশে তাদের যেতেই হলো।

*

একটা নির্জন জায়গায় এসে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো বনহুর। মনিরাকেও নামিয়ে নিলো সে অশ্ব থেকে। মনিরার দু'চোখে বিস্ময় আর আনন্দ যেন উপচে পড়ছে। আজ সে নিজের চোখে স্বামীকে যেভাবে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে লড়তে

দেখলো তা বিস্ময়কর বটে। মনিরা শুধু বিস্মিতই হয়নি, হয়েছে মুগ্ধ স্তম্ভিত। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দাঁড়িয়ে দু'চোখ বিস্ফারিত করে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো মনিরা।

বনহুরের ললাটে ফুটে উঠেছিলো বিন্দু বিন্দু ঘাম, হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মুছে নিয়ে বললো বনহুর–কি দেখছো?

তোমাকে!

আমাকে?

হাঁ।

হাসলো বনহুর–মনিরা, এ অদ্ভুত উক্তি তোমার মুখে আশ্চর্য বটে...

জানো না আমি তোমার মধ্যে যে রূপ আজ দেখেছি তা শুধু আমাকে স্তম্ভিতই করেনি, আমি অভিভূত হয়ে পড়েছি। সত্যি তুমি এক বিস্ময়....মনিরা স্বামীর বুকে মুখ গুজলো।

বনহুরের বাহু দুটো তখন গভীর আবেগে মনিরাকে টেনে নিলো আরও কাছে নিবিড় করে। বাম হাতে ওর মুখখানা উঁচু করে ধরতেই বললো মনিরা–ছিঃ তাজ রয়েছে।

ও মুখ ফিরিয়ে আছে ওদিকে দেখছোনা? বললো বনহুর।

নির্জন স্থানে মনিরা আর বনহুর বসলো পাশাপাশি। পিছনে পর্বতের সারি, দু'পাশেও পর্বতমালা সম্মুখে প্রান্তর, ঠিক প্রান্তর বলা চলে না, কিছুটা ফাঁকা জায়গা।

সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা বর্ণের ছোট ছোট পাখি। বিচিত্র তাদের বর্ণ, বিচিত্র তাদের কণ্ঠস্বর। বনহুর বললো কি সুন্দর, না?

মনিরার বিস্ময় তখনও কাটেনি, সে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে স্বামীর পৌরুষদীপ্ত মুখমন্ডলের দিকে। যতই দেখছে ততই সে আরও অবাক হচ্ছে।

নিজকে ধন্য মনে করছে মনিরা, যদিও সে জানে তার স্বামী বিশ্ববিখ্যাত শক্তিশালী ব্যক্তি, তবু আজ নতুন রূপে স্বামীকে মনিরা দেখছে।

বললো মনিরা–তোমার স্ত্রী হতে পেরেছি এ আমার কতবড় সৌভাগ্য তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না।

থাক ওসব কথা। একটু থেমে বললো বনহুর–জায়গাটা ভারী সুন্দর কিন্তু।

মনিরার কানে স্বামীর কথাগুলো অপূর্ব শোনালো, একটু পূর্বে সে বীর বিক্রমে তাকে লড়াই করতে দেখেছে। যাকে সে ভিন্ন এক মানুষরূপে মনে করেছে সে যেন কত দূরের মানুষ–আর এখন মনে হচ্ছে সত্যিই সে তার আপন জন.......

কি ভাবছো মনিরা

ভাবছি হঠাৎ ধূমকেতুর মত কোথা থেকে তুমি আবির্ভূত হলে ঐ মুহূর্তে? সত্যি আমি ভাবতেও পারিনি তুমি আসবে।

সে কথা এখন নাইবা ভাবলে মনিরা! জায়গাটা ভারী সুন্দর আর নির্জন। আমার কিন্তু বেশ লাগছে দেখো তাজ কেমন আপন মনে খেতে শুরু করে দিয়েছে।

হাঁ, তোমার তাজ তোমার মতই খুশি হয়েছে দেখছি! আচ্ছা, তুমি হঠাৎ তাজকে কোথায় পেলে?

আমি পুলিশ ভ্যানটি নিয়ে কৌশলে পারিয়ে যেতে সক্ষম হই এবং দ্রুত আমার আস্তানায় গিয়ে উপস্থিত হই। তারপর তাজকে নিয়ে যে পথে প্রথম শহর থেকে সেই ডাকবাংলোয় পৌঁছেছিলাম তার বিপরীত পথে এসে পড়ি। সাঁওতাল পল্লীতে প্রবেশ করতেই এক সাঁওতাল যুবক আমাকে জানালো পুলিশ বাহিনী বৌরাণী রেশমা আর ফাগুয়াকে ধরে নিয়ে গেছে এবং এই পথে গেছে...সে আংগুল দিয়ে সেই পথ দেখিয়ে দিয়েছিলো। অবশ্য আমার মুখ তখন খোলা ছিলো বলেই সাঁওতাল যুবক আমাকে চিনতে পেরেছিলো।

সত্যি আমার পরম ভাগ্য।

সেকথা মিথ্যে নয় মনিরা, পুলিশ বাহিনী আমাকে হাতের মুঠায় পাওয়ার জন্য তোমার উপর নানা অশোভনীয় আচরণ করতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মনিরা স্বামীর পাশে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। আরও নিবিড় করে পেতে চায় সে স্বামীকে। বলে মনিরা–তুমি যাই বলল, আমি ফিরে যাবো না।

অবাক কণ্ঠে বললো বনহুর–সেকি, কেন ফিরে যাবে না মনিরা

তোমাকে এমন একান্ত নিবিড় করে পাবো না তাই। এখানে শুধু তুমি আর আমি। যত বিপদ আসুক মাথা পেতে নেবো, তবু তুমি থাকবে আমার পাশে……

মনিরা!

হাঁ, তোমাকে হারাতে চাই না আর।

কিন্তু এখানে এভাবে কদিন থাকতে পারবে?

যুগ যুগ কাটাতে পারবো যদি তুমি আমার পাশে থাকো।

কিন্তু এখানে খাবে কি, থাকবে কোথায়?

দস্যু বনহুরের থাকার জায়গার অভাব হবে, এ আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া বলেছি তো তুমি যদি পাশে থাকো তাহলে মৃত্তিকা শয্যাও আমার কাছে দুগ্ধ ফেনিল কোমল শয্যা বলে মনে হবে–আর খাবার কথা বলছে, তা ভাবনা কি, গাছের ফল খাবো আর ঝর্ণার পানি…..

কিন্তু মা যে তোমার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন তাকি তুমি ভুলে গেছো মনিরা

না ভুলিনি, তবে মা জানেন আমি তোমার সঙ্গে আছি।

তাই তিনিও নিশ্চিন্ত আর তুমিও, তাই না?

হাঁ, শুধু নিশ্চিন্ত নই–পরম নিশ্চিন্ত আমি।

কিন্তু আমার সঙ্গে থাকা অভিশাপ একথা ভুলে গেলে এরই মধ্যে?

অভিশাপ!

তা নয়তো কি, দেখলে তো আমার জন্য পুলিশবাহিনী তোমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো।

কিন্তু তুমি তো উদ্ধার করে নিলে তাদের কবল থেকে।

নিলাম কিন্তু কত কষ্ট তোমাকে পোহাতে হলো।

এ আমার পরম শান্তি, পরম আনন্দ……মনিরা স্বামীর কাঁধে মাথা রাখলো।

তাজ তখন নিশ্চিন্ত মনে অদূরে ঘাস খাচ্ছিলো, মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিচ্ছিলো প্রভুকে।

বললো বনহুর–চলো অন্ততঃ আজকের রাতটা কাটানোর জন্য জায়গার সন্ধান করি।

মনিরা আর বনহুর এগুলো।

পাশাপাশি চললো ওরা দুজন।

তাজও চললো ওদের পিছু পিছু। সে যেন বুঝতে পারলো–প্রভু এখন আশ্রয়ের সন্ধান করতে চললো। অদূরে পাহাড়টার দিকে এগুলো বনহুর আর মনিরা। বিরাট আকার পাহাড় না হলেও ছোটও। নয় একেবারে।

বনহুর আর মনিরা রাত্রি কাটানোর জন্য সুন্দর পরিচ্ছন্ন একটা জায়গার সন্ধান করে ফিরতে লাগলো, ক্রমেই উপরের দিকে উঠছে ওরা।

সন্ধ্যার এখনও অনেক বাকি।

সূর্যের আলো কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে সোনালী আলোর ছটা লুকোচুরি খেলছে যেন। অপূর্ব এ দৃশ্য, মুগ্ধ নয়নে দেখে মনিরা।

বড় ভাল লাগছে। বললো মনিরা।

বনহুর হাসলো।

আরও কিছুটা উপরে উঠতেই ওপাশে নজর পড়লো, মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা তারপর পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে কয়েকটা গর্ত ঠিক গুহগার মত।

বনহুর আনন্দধ্বনি করে উঠলো–পেয়েছি—পেয়েছি

কি পেয়েছো?–বললো মনিরা।

ঐ দেখো চারপাশে পাহাড়ের দেয়াল, সম্মুখে তৃণক্ষেত সুন্দর পাশাপাশি কয়েকটা গুহা–দস্যু বনহুরের যোগ্য স্থান বটে।

সত্যি ভারী সুন্দর!

চলো পথ খুঁজে বের করি।

চলো।

মনিরা আর বনহুর ওপাশে এগুলো। গুহাগুলোতে পৌঁছবে তারা।

বললো মনিরা–তাজকে ছেড়ে যাচ্ছো, ওর কি হবে?

বনহুর বললো–ওকে বলে আসি তুমি অপেক্ষা কর। বনহুর লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে এলো নিচে, তাজ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো সেখানে এসে তাজের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো–তুই এখানে থাকবি তাজ, আমি না আসা পর্যন্ত প্রতীক্ষা করবি। কথাগুলো বলে পুনরায় ফিরে গেলো বনহুর কিন্তু মনিরাকে সে দেখতে পেলো না।

বনহুর মনে করলো আশেপাশে কোথাও সরে গেছে, তাই সে নাম ধরে ডাকতে শুরু করলো– মনিরা–মনিরা–মনিরা……

কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ এলো না।

বনহুর চিন্তিত হলো।

দৃষ্টি ফেললল সে চারদিকে, একটু গভীর দুশ্চিন্তা মুহূর্তে তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। এপাশে ওপাশে ঝুঁকে মুখের কাছে হাত রেখে ডাকতে লাগলোমনিরা–মনিরা–মনিরা।

একি, কোথায় গেলো মনিরা এই সামান্য সময়ের মধ্যে! এ পাশে ওপাশে অনেক সন্ধান করলো কিন্তু মনিরাকে কোথাও খুঁজে পেলো না সে।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে।

পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে।

বনহুর তন্ন তন্ন করে খুঁজলো, কিন্তু কোথাও মনিরাকে পেলো না। পাহাড়ের উপর সে বসে পড়লো ধপ করে। এমন দুশ্চিন্তায় বনহুর পড়েনি কখনও। দুহাতে মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে লাগলো।

ক্রমেই অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠলো। আকাশে ফুটে উঠলো অসংখ্য তারার মালা।

ক্ষুধায় বনহুরের পেট চো চো করছে।

এমনভাবে মনিরাকে হারাবে ভাবতে পারেনি বনহুর। একটু পূর্বে যাকে এখানে রেখে গেলো, সে গেলো কোথায়? ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা করছে বনহুরের কিন্তু সে কাঁদতে পারছে না, কে যেন তার গলাটা দুহাতে চেপে ধরেছে বলিষ্ঠ হাতে।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘন হয়ে এলো। তারপর জমাটা অন্ধকার আরও জমাট হলো। শীতল হাওয়া বইতে শুরু করলো। বনহু একা বসেই আছে পাহাড়ের উপরে আর পাহাড়ের নিচে তাজ দাঁড়িয়ে আছে প্রভুর ফিরে আসার প্রতীক্ষায়।

বনহুর জামার পকেট থেকে বের করলো তার ক্ষুদে ওয়্যারলেস যন্ত্রটা, কথা বলতে লাগলো নূরীর সঙ্গে....নূরী, রহমান ফিরে এসেছে...জবাব এলো নূরীর দিক থেকে...তুমি কোথা থেকে বলছে হুর....নির্জন এক পাহাড়ের উপরে বসে কথা বলছি তোমার সঙ্গে....বনহুরের কণ্ঠ কেমন যেন ভাবালু মনে হলো নূরীর কাছে বললো নূরী...নির্জন পাহাড়ের উপরে তুমি, এত রাতে কি করছে হুর....নূরীর জবাবে বললো বনহুর...আমি যা বলি তার জবাব আগে দাও... বনহুরের কণ্ঠস্বর গম্ভীর মনে হলো নূরীর কাছেরী বললো...রহমান ফিরে এসেছে, সমস্ত দিন সে কান্দাইয়ের অলিগলি তন্ন তন্ন করে সন্ধান করে ফিরেছে ফুল্লরার, কিন্তু সে তাকে পায়নি....এখন রহমান কোথায় বললো বনহুর....নূরী জবাব দিলো...নাসরিনের কক্ষে, বেচারী নাসরিন কন্যার জন্য কেঁদে কেঁদে পাগলিনী হয়ে পড়েছে, রহমান হয়তো তাকেই সান্ত্বনা দিচ্ছে....বনহুর বললো–

আমি নতুন এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছি নূরী। তুমি জানতে এবং জানো আপাততঃ মনিরা আমার সঙ্গে ছিলো....থামলো বনহুর....নূরীর কণ্ঠ ভেসে এলো...তুমি তো তাই বলেছিলে হুর, বৌরাণী তোমার সঙ্গে আছে.....বললো বনহুর....না এখন সে নেই নূরী, হঠাৎ সে কোথায় হারিয়ে গেলো এই নির্জন পাহাড়ের কোথায় সে অন্তর্ধান হলো আমি তাকে খুঁজে পাচ্ছি না...নুরী বললো, একি সংবাদ শোনাচ্ছো হুর, বৌরাণী তোমার সঙ্গে ছিলো অথচ এখন সে নেই... বললো বনহুর...না জানি না সে এখন কোথায়, জীবিত আছে না তার মৃত্যু ঘটেছে জানি না।...নুরীর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ ভেসে এলো... না না, তার মৃত্যু ঘটতে পারে না হুর, সে যে তোমার স্ত্রী, তোমার সহধর্মিনী...বনহুর বললো–নূরী, যদি আমার মঙ্গল চাও তবে রহমানকে পাঠিয়ে দাও....কোথায় পাঠাবো ঠিকানা বলে দাও হুর....কান্দাইয়ের কোন দিকে কোথায় আছো জানাও...বনহুর বললো....কান্দাই এর দক্ষিণে যে মেঠো পথ আছে ঐ পথ ধরে এগিয়ে এলেই.......

ঠিক ঐ মুহূর্তে সা করে একটা শব্দ হলো তারপর ঘচ করে উঠলো বনহুরের পাশে। মনে হলো একখানা তীরফলক এসে গেথে গেলো তার পিছনে মাটিতে।

অন্ধকার হলেও তারার আলোকে বেশ আলোকিত চারদিক। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সবকিছু তবে কিছুটা ঝাপসা। তীরফলকটা দৃষ্টি এড়ালোনা তার। চমকে উঠে দাঁড়ালো বনহুর, তারপর তীরফলক তুলে নিলো হাতে। অবাক হলো, তীরফলকে এক খন্ড কাগজ আটকানো আছে। বনহুর পকেট থেকে ছোট্ট পেনসিল টর্চটা বের করলো এবং তীরফলক থেকে কাগজখানা খুলে মেলে ধরলো চোখের সামনে। কিন্তু কাগজে সামান্য দুটি শব্দ ছাড়া লিখা–দস্যুরাণী।

এতক্ষণে বনহুর কতকটা নিশ্চিন্ত হলো যেন, সে বুঝতে পারলো মনিরাকে চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং নিয়ে গেছে দস্যুরাণী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর সাবধানে নেমে এলো নিচে, তাজ তখনও দাঁড়িয়ে আছে ঠিক পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। বনহুর তাজের পিঠে চেপে বসলো।

তাজ ছুটতে শুরু করলো।

কিন্তু বেশিদূর এগুতে পারলো না বনহুর, হঠাৎ একটা ফাস এসে দেহের ঠিক মাঝামাঝি এসে আটকে পড়লো। বনহুর তাজের পিঠ থেকে পড়তে পড়তে বেঁচে

গেলো। সঙ্গে সঙ্গে থেমে পড়লে তাজ।

ফাসখানা বনহুরকে তুলে নিলো শূন্যে।

তাজ চিহি শব্দ করে উঠলো পিঠখানা শূন্য হবার সঙ্গে সঙ্গে। তাজের বুঝতে বাকি রইলো না প্রভু বিপদে পড়েছে। যদিও অন্ধকার তবু দেখতে পাচ্ছে তাজা, তার প্রভু শূন্যে ঝুলছে। ফাসখানা তার দেহের মাঝামাঝি আটকে পড়েছে। পশু হলেও বুঝতে পারলো সে, মুহূর্ত বিলম্ব না করে সে সরে গেলো আড়ালে। আড়ালে গেলেও তার দৃষ্টি ছিলো সেইদিকে যেখানে ফাসের সঙ্গে ঝুলছে বনহুর।

ততক্ষণে দু'জন জমকালো মূর্তি এগিয়ে এলো ওপাশ থেকে। তাদের হাতে ছিলো লম্বা বর্শা জাতীয় বস্তু। তারা এবার গাছটার নিচে এসে দাঁড়ালো এবং ফাঁস সহ বনহুরকে নামিয়ে আনলো গাছের তলায়।

কিন্তু নিচে নামিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা জাল বা বেষ্টনী বনহুরের মাথার উপর ছড়িয়ে পড়লো।

বনহুর একচুল আর নড়তে পারছে না।

যারা বর্শা হাতে অপেক্ষা করছিলো তারা এগিয়ে এলো দ্রুতগতিতে। দুপাশ থেকে তারা বনহুরকে বেষ্টনী সহ ধরে ফেললো।

বনহুরের কোমরের বেল্টে রিভলভার এবং সূতীক্ষধার ছোরা রয়েছে কিন্তু তার হাত দু'খানা বন্দী থাকায় সে তার অস্ত্র ব্যবহার করবার সুযোগ পেলো না।

লোক দুজন বনহুরকে বেঁধে ফেললো এবং পাকড়াও করে নিয়ে চললো।

যে পথে লোক দু'জন বনহুরকে নিয়ে চললো সেই পথে তাজও এগুলো তাদের পিছনে পিছনে।

আকাশে অসংখ্য তারার মালা।

নিচে দস্যু বনহুরকে বন্দী করে নিয়ে চলেছে দু'জন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। কোথায় নিয়ে চলেছে, কেন তাকে বন্দী করা হলো কিছুই বুঝতে পারছে না

বনহুর। পাহাড়ের নিকটবর্তী হতেই বনহুরের চোখ দুটো বেঁধে দিলো ওরা কালো কাপড় দিয়ে। তারপর কোন্ পথে নিয়ে চললো কিছুই সে বুঝতে পারল না।

বনহুর কৌশলে তার রুমালখানা ফেলে দিলো ওদের অলক্ষ্যে।

*

বহুক্ষণ চলার পর এক সময় তাকে নিয়ে হাজির হলো ওরা ওদের গন্তব্য জায়গায়। কোথায় তাকে আনা হলো তা অবশ্য বনহুর বুঝতে পারলো না কিন্তু অনুমানে বুঝতে পারলো জায়গাটা যেখানেই হোক ভূগর্ত তাতে কোনো ভুল নেই।

চোখের বাধন মুক্ত করে দিতেই বনহুর চোখ তুলে তাকালো সম্মুখের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত হলো সে। সম্মুখে উঁচু আসনের পাশে দন্ডায়মান এক নারীমূর্তি। নারীমূর্তির মুখমন্ডলের নিম্নভাগ যদিও কালো রুমালে ঢাকা ছিলো তবু বনহুর চিনতে পারলো এ নারী অন্য কেউ নয়, স্বয়ং দস্যুরাণী। কুঞ্চিত করে বনহুর দস্যুরাণীর চোখ দুটোর দিকে, তারপর বললো–ও, তুমি!

দস্যুরাণী বললো–হা, আমি!

বনহুর বললো–হঠাৎ আমার উপর এ অভিমান কেন?

এখনও বুঝতে পারোনি? বললো দস্যুরাণী।

বনহুর বললো–হরিহরের কাষ্ঠ কারাগার থেকে যখন তুমি আমাকে মুক্ত করেছিলে তখনই আমি বুঝতে পেরেছি নিশ্চয়ই এর পিছনে কোনো মতলব আছে।

কিন্তু কি মতলব ছিলো তা বুঝি বুঝতে পারোনি বা অনুমান করতে পারোনি এখনও।

হাঁ বললে মিথ্যা বলা হবে তাই সত্যি না বলে পারছি না–তোমার অনুমান সত্য।

দস্যু সম্রাট, তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে কোনোদিন আমার বিরুদ্ধাচারণ করবে না? কিন্তু তুমি তোমার কথা রক্ষা করোনি।

তার মানে?

মানে আমার অবস্থান এলাকায় তুমি কোনোদিন প্রবেশ করবে না। কিন্তু তুমি কথা দিয়ে কথা রক্ষা করতে পারেনি। তা ছাড়াও তুমি আমার কারাগার থেকে কৌশলে পালিয়েছিলে। এবার তোমাকে হাতের মুঠায় পেয়েছি। জানো তোমার অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদন্ড....এবং মৃত্যুদন্ড হবে তোমার, কথা দিয়েও কথা রক্ষা করোনি বলে।

আমি আমার অপরাধ এখনও সঠিক জানিনি, কাজেই সত্যি মৃত্যুদন্ড আমার জন্য প্রয়োজন কিনা তা বুঝতে পারছি না।

দস্যুরাণীর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো, ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললোকান্দাই ছেড়ে তুমি কতদূর এসেছে সেদিকে খেয়াল আছে তোমার?

নিশ্চয়ই আছে। তবে তোমারও জেনে রাখা দরকার দস্যু বনহুরের অবস্থান বিশ্বময়, কাজেই আমি অপরাধী নই এবং মৃত্যুদন্ডও আমার জন্য প্রয়োজন নয়। আর আমি যদি অপরাধই করে থাকি তবে তুমি, কেন হরিহরের কবল থেকে আমাকে মুক্ত করতে গেলে? বলো রাণীজী, জবাব দাও আমার প্রশ্নের সে জবাব তুমি পাবে না, তবে শুনে রাখো তোমাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম...

অনুগ্রহ! হাঃ হাঃ হাঃ, তুমি বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলে দস্যু বনহুর কারও অনুগ্রহপ্রার্থী নয়।

আমি যদি তোমাকে ঐ মুহূর্তে বাঁচিয়ে না নিতাম তাহলে আজ এখানে এই হাম্মাম পাহাড়ে তোমার ছায়া পড়তো না।

হাম্মাম! এই পাহাড়ের নাম হাম্মাম যাক রাণীজী, পাহাড়টার নাম বলে তুমি ভালই করলে। এবার বলল মনিরা কোথায়?

মনিরা! শব্দটা উচ্চারণ করে খিল খিল করে হেসে উঠলো দস্যুরাণী। তারপর হাসি থামিয়ে বললোবনহুর, তুমি মনিরাকে দেখতে চাও?

না, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

তা হবে না, তাকে তুমি দেখতে চাইলে দেখাতে পারি কিন্তু ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

বনহুর হাত দু'খানা সহ দেহের মাঝামাঝি ফাঁসটা এখনও আটকানো আছে এবং সে কারণে বনহুর হাত দুখানার সব্যবহার করতে পারছে না। অবশ্য পা দুখানা তার এখনও মুক্ত রয়েছে।

বনহুর এবার তাকালো রাণীর চোখ দুটোর দিকে, তারপর বললো–কারণ?

কারণ তোমার অপরাধে সেও অপরাধী…

দস্যুরাণী, ভেবেছিলাম তুমি বুদ্ধিমতী কিন্তু এখন যে পরিচয় তোমার পেলাম তাতে তুমি নিতান্ত বুদ্ধিহীনা ছাড়া কিছু নও।

বনহুর, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

তবু বলছ, এই তো?

হাঁ, মনে রেখো আমার অনুগ্রহ।

অনুগ্রহ যখন প্রথম থেকেই দেখিয়ে আসছে তখন আশা করবো এবারও আমার উপর অনুগ্রহ দেখাবে। বলে কি উপকার তুমি চাও আমার কাছে।

পুনরায় খিল খিল করে হেসে উঠলো দস্যুরাণী, তারপর সে করতালি দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলো চন্দন।

রাণীকে কুর্ণিশ জানিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

দস্যুরাণী বললো–চন্দনা, বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনহুর আমাদের সম্মুখে দন্ডায়মান।

হাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি রাণী।

চন্দনা পুলিশবাহিনী তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় নি……

বনহুর হেসে বলে–তা সত্য নয়, কারণ পুলিশ বাহিনী বা পুলিশমহল আমাকে বেশ কয়েকবার গ্রেপ্তার করে হাঙ্গেরী কারাগারে আবদ্ধ করেছিলো, তবে বলতে পারো আটক করলেও আটকে রাখতে পারেনি।

বনহুর, তুমি দস্যুর সম্রাট হলেও আমি তা মানি না। তুমি আমার বন্দী কাজেই বন্দীর মত কথা বলবে। শোন যা বলছিলাম।

বেশ বলো?

পুলিশ বাহিনী তোমাকে আটকে রাখতে না পারলেও আমি তোমাকে আটকাতে সক্ষম হবে এবং আটকে রাখবো সারা জীবন।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো বনহুর, তারপর হাসি থামিয়ে বললো–চমৎকার, সারাজীবন তুমি আমাকে আটকে রাখবে। কত সুন্দর কথা! রাণীজী, এর পূর্বেও তুমি আমাকে বন্দী করতে সক্ষম। হয়েছিলে। জাহাজের ক্যাবিন থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় তুমি আমাকে চোরের মত চুরি করে এনেছিলে যদিও .. আমার কোনো অপরাধ ছিলো না……

পুরোনো কথা আমি তুলতে চাই না বনহুর, তবে মনে রেখো আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়……

মানে শক্তিশালিনী, এইতো?

ঠাট্টা করো না, এই দন্ডে তোমার হাত-পা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারি। চন্দনা, ওকে আমার বন্দীশালায় নিয়ে যেতে বল্। মনে করোনা বনহুর, এবারও তুমি চন্দনা আর প্রহরীদের চোখে ফাঁকি দিয়ে পালাবে।

মিছামিছি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করার ভান করে নিজের দেহের বন্ধনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে বনহুর–পালাবার কোনো উপায় আছে নাকি! রাণীজী, মেহেরবানি করে কিছু খাবার যদি দেবার অনুমতি দিতে, তাহলে..

খাবার খাবে? চন্দনা, ওকে একটুকরো শুকনো রুটি এনে দে। আর শোন বন্দীশালায় নিয়ে যাবার পূর্বে কালো কাপড়ে শক্ত করে চোখ বেঁধে নিয়ে যাবি।

আচ্ছা রাণী, তোমার আদেশ ঠিকমত পালন হবে। চন্দনা প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে বলে–নিয়ে চলো ওকে।

বনহুর দস্যুরাণীকে লক্ষ্য করে বললো–আমার প্রশ্নের জবাব না শুনে যাবে না। বলো মনিরা কোথায়?

দস্যুরাণী এবার গম্ভীর গলায় বললো–বলেছি তাকে দেখতে পাবে কিন্তু তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

বেশ, তাকে আমি দেখতে চাই।

যাও চন্দনা, নিয়ে যাও ওকে। কথাটা বলে দস্যুরাণী আসন গ্রহণ করলো।

চন্দনা প্রহরীদ্বয়কে বললো–নিয়ে চলো।

বনহুরের দু'পাশে দু'জন অনুচর ছিলো, তারা বনহুরের বাহু ধরে ফেললো।

কিন্তু বনহুর এক ঝুঁকি নিয়ে ওদের হাতের মুঠা থেকে নিজের বাহু দুটিকে মুক্ত করে নিয়ে বললো চলো কোথায় যেতে হবে?

চন্দনা বললো–চোখ বাঁধতে হবে, তারপর নিয়ে যাওয়া হবে।

বেশ, রাজি আছি। বললো বনহুর।

চন্দনা নিজ হাতে বনহুরের চোখে পট্টি বেঁধে দিলো।

এবার বনহুর এগুলো।

তার হাত দুখানা যদিও বেষ্টনী দ্বারা দেহের সঙ্গে বাঁধা পড়েছে, তবু চন্দনা ওর হাত ধরলো, বললো–চলো আমার সঙ্গে।

অনুচরদ্বয় চললো পাশে পাশে।

কোথায় নিয়ে চললো ওরা বনহুর জানে না, সে সুবোধ বালকের মত এগিয়ে চললো। বনহুরের বড় হাসি পাচ্ছিলো, কারণ এমনি করে তার অনুচররাও অপরাধী জনকে চোখ বেঁধে নিয়ে যায় বন্দী শালায় আজ তার সেই অবস্থা। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এরা তা সে জানে না।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর চন্দনা বনহুরের চোখের বাধন খুলে দিলো।

বনহুর বললো–হাতের বাধন খুলে দেবে না তোমরা?

না, রাণীর নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তোমার দেহের বাধন বা হাতের বাঁধন মুক্ত করা হবে না।

তবে চোখের বাঁধন খুললে কেন?

রাণীর নির্দেশেই তোমার চোখের বাঁধন খোলা হলো। সম্মুখে তাকিয়ে দেখো দম্রাট, যাকে তুমি। দেখতে চেয়েছে তাকে দেখতে পাবে। বনহুর তাকালো সম্মুখের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত হলো, দেখতে পেলো একটা খাটে নিদ্রিত অবস্থায় শায়িত আছে মনিরা। চিনতে ভুল হলো না তার। বনহুর কয়েক মুহূর্ত নিখুপ থেকে ডাকলো–মনিরা!

কিন্তু কোনো সাড়া এলো না।

বনহুর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো, কয়েক পা এগুলো সে দ্রুত গতিতে কিন্তু সম্মুখে বাধা পেলো, কাঁচের দেয়ালের সঙ্গে মাথাটা ফটুকে গেলো তার। এবার বনহুর বুঝতে পারলো মনিরাকে সংজ্ঞাহীন করে রাখা হয়েছে, তাই সে মৃতের ন্যায় শায়িত আছে। তা ছাড়া কাঁচের দেয়ালের ওপাশে আছে, তাই সে শুনতে পাচ্ছে না হয়তো তার ডাক।

বনহুর বললো–তোমরা কেন এভাবে আটকে রেখেছো?

তোমাকে হাতের মুঠায় আনার জন্য।

বনহুর হেসে বললো–এই তো আমাকে তোমরা হাতের মুঠায় পেয়েছে, এবার মনিরাকে তোমরা মুক্তি দাও।

বেশ, রাণীর কাছে কথাটা জানাবো। চন্দনা ইংগিত করলো অনুচরদ্বয়কে।

অনুচরদ্বয় বনহুরকে নিয়ে চললো আবার।

তবে পুনরায় তার চোখ বেঁধে দেওয়া হলো।

বনহুর হাত বাড়ালো সম্মুখের দিকে।

চন্দনা ওর হাত ধরলো।

এমন এক জায়গায় বনহুরকে নিয়ে যাওয়া হলো যেখান থেকে কারও সাধ্য নেই বেরিয়ে আসে। ভূগর্ভে ঐ কারাকক্ষ, চারদিকে লৌহ বেষ্টনীর দেয়ার। দরজা ছাড়া আলো–বাতাস প্রবেশের কোনো পথ নেই।

বনহুরকে সেই মজবুত কারাকক্ষে বন্দী করার পর তার হাত এবং দেহের বাধন খুলে দেওয়া হলো।

চন্দনা নিজ হাতে কারাকক্ষের লৌহদরজা বন্ধ করে দিলো সুইচ টিপে।

বনহুর মৃদু হাসলো তারপর তাকালো সে চারপাশের লৌহ বেষ্টনী ঘেরা দেয়ালের দিকে।

*

দস্যুরাণী আর চন্দনা এসে দাঁড়ায় পাহাড়ের পাশে ঝর্ণার ধারে। ভোরের হাওয়া ধীরে ধীরে বইছে। ঝর্ণার পানিতে সাঁতার কাটছে কতকগুলো বুনো রাজ হাঁস।

দস্যুরাণী নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে সেইদিকে।

চন্দনা বললো–রাণী, দস্যু বনহুর তোমার কাছে অপরাধী কিন্তু তার স্ত্রী মনি....সে কি অপরাধ করেছে যার জন্য তাকে আটক করেছে?

দস্যু বনহুরকে আটক করার জন্যই আমি তার স্ত্রীকে আটক করেছি। জানিস চন্দনা, সেদিন যদি কৌশলে মনিরাকে সরিয়ে না আনতাম তাহলে বনহুরকে গ্রেপ্তার করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না। একটু থেমে বললো দস্যুরাণী–যেদিন বনহুর তোর সঙ্গীদের চোখে ধুলো দিয়ে আমার কারাগার থেকে সরে পড়তে সক্ষম হয়েছিলো সেইদিন আমি শপথ করেছিলাম দস্যু বনহুরকে আটক করবোই...সে সুযোগ আমার এতদিনে এসেছে।

তাহলে দস্যু বনহুরকে সহজে আর মুক্তি দিচ্ছে না?

চন্দনার কথায় দস্যুরাণীর মুখমন্ডল ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠলো। দাঁতে দাঁত পিষে বললো দস্যুরাণীবনহুরকে হাতের মুঠায় পেয়েছি...তাকে মুক্তি দেবো আমি!

চন্দনা, আমি ওকে চিরদিন আটক করে রেখে বিশ্ববাসীকে দেখাতে চাই দস্যুরাণীর অসাধ্য কিছু নেই। হাঙ্গেরী কারাগার যাকে আটকে রাখতে পারেনি, দস্যুরাণী তাকে আটকে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

রাণী, মনিরাকেও কি তুমি দস্যু বনহুরের সঙ্গে আটকে রাখতে চাও?

না, তার কোনো অপরাধ নেই।

তবে?

সংজ্ঞা ফিরে এলেই তাকে পৌঁছে দেবো তার বাসভবনে।

কিন্তু..

বলো কিন্তু কি?

মনিরা যদি স্বামীকে ছেড়ে যেতে না চায়?

সে জানবে না তার স্বামী আমার বন্দীশালায় আটক আছে।

রাণী!

বল?

স্বামীকে ছেড়ে কোনো রাণী বাঁচতে পারে? তুমি নিজের কথা একবার ভেবে দেখেছো? মিঃ আহাদ চৌধুরীকে রেখে এসে কত ব্যথা অনুভব করছে–সারা দিন ভাবছো তার কথা।

চন্দনা, এসব কি বলছিস তুই?

যা সত্য তাই বলছি।

ও সব কথা রাখ, এখন কাজের কথায় আসা যাক। দস্যু বনহুরকে আটক করেছি এ আমার শুধু গর্বই নয়, আমার চরম সফলতা। বনহুর বুঝুক নারী হলেও আমি তার চেয়ে কোনো অংশে কম নই!

ঠিকই বলেছো রাণীজী, নারী হলেও তুমি পুরুষের চেয়ে কোনো অংশে কম নও...

চমকে ফিরে তাকালো দস্যুরাণী আর চন্দনা। তারা চোখে সর্ষে ফুল দেখার মত ক্ষণিকের জন্য নির্বাক হয়ে গেলো। দেখলো তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং দস্যু বনহুর। তার বলিষ্ঠ মুখমন্ডল দীপ্ত উজ্জ্বল।

দস্যুরাণী মুহূর্তের জন্য নির্বাক হলেও সে নিজকে সামলে নিলো সঙ্গে সঙ্গে এবং কোমরের বেল্টের রিভলভারে হাত দিতেই বনহুর দস্যুরাণীর হাতখানা মুঠায় চেপে ধরলো।

চন্দনা করতালি দিলো এক-দুই-তিন বার।

কিন্তু কেউ এলো না।

বনহুর হেসে বললো–দস্যুরাণীর অনুচরগণ সবাই বিশ্রাম করছে, এখন তারা আসবে না।

বনহুরের হাতের মুঠা থেকে দস্যুরাণী এক ঝটাকায় নিজের হাতখানাকে মুক্ত করে নিলো কিন্তু সে পুনরায় কোমরের বেল্টের অস্ত্রে হাত বাড়ালো না। ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো সে।

বনহুর বললো–রাণীজী, ভাবছো কেমন করে তোমার লৌহ কারাগার থেকে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু অবাক হবার কিছু নেই, কারণ হাঙ্গেরী কারাগার আমাকে ধরে রাখতে পারে নি আর তোমার ভূগর্ত কারাগার আমাকে আটকে রাখতে পারবে, এমন চিন্তা তোমার অহেতুক বুঝলে?

দস্যুরাণী দাতে দাঁত পিষতে লাগলো।

চন্দনার চোখেমুখেও ক্রুদ্ধভাব ফুটে উঠেছে। সে ভেবে পাচ্ছে না কি করে বনহুর তাদের লৌহবেষ্টনী কারাকক্ষ থেকে বের হতে সক্ষম হলো।

বনহুর বললো–রাণীজী, তুমি হয়তো তোমার অনুচরদের উপর ক্রুদ্ধ হচ্ছে এবং তাদের চরম শাস্তির ব্যবস্থা মনে মনে আঁটছে কিন্তু জেনে রাখো তাদের কোনো দোষ নেই–তারা সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

শিস দিলো বনহুর।

এবার আরও বিস্মিত হলো দস্যুরাণী ও চন্দনা, পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো তাজ, তার। পিঠে শায়িত মনিরা।

এখনও মনিরার সংজ্ঞা ফিরে আসেনি, তার দেহের অর্ধেক অশ্বের এ পাশে অর্ধেক ওপাশে।

বনহুর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চেপে বসলো অশ্বপৃষ্ঠে। উল্কাবেগে ছুটলো তাজ। মুহূর্তে এই ঘটনা ঘটে গেলো। দস্যুরাণী দ্রুত কোমরের বেল্ট থেকে রিভলভার খুলে নিয়ে গুলী ছুড়লো বনহুরকে লক্ষ্য করে। কিন্তু ততক্ষণে বনহুর তাজের পিঠে বহুদূর সরে গেলো দস্যুরাণীর রিভলভারের সীমার বাইরে।

দস্যুরাণী ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো, তার সুন্দর গোলাপী মুখখানা লাল হয়ে উঠলো। জোরে মাটিতে পদাঘাত করে বললো–চন্দনা রুহীকে নিয়ে আয়, আমি ওকে সায়েস্তা না করে ছাড়বো না।

চন্দনা বললো–দস্যুরাণী, দস্যু বনহুরের পিছনে ধাওয়া করে কোনো ফল হবে না বরং তাকে সায়েস্তা করবার নতুন পথ আবিস্কার করো।

দস্যুরাণী অধর দংশন করছিলো, বললো এবার সে–চন্দনা, একবার নয়, দু'বার সে আমাকে……

চন্দনা মাঝপথে বলে উঠলো–নাকানি চুবানি খাইয়ে ছাড়লো।

আমি এবার ওকে আটক করে কারাগারে নিক্ষেপ করবার পূর্বে অন্ধ করে দেবো অগ্নিদগ্ধ লৌহশলাকা চোখে প্রবেশ করিয়ে। কিছুতেই সে রেহাই পাবে না……

এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসে দস্যুরাণীর একজন অনুচর–রাণীজী, রাণীজী, সর্বনাশ হয়ে। গেছে।

দস্যুরাণী গম্ভীর কণ্ঠে বললো–জানি কি সর্বনাশ হয়েছে।

রাণীজী।

যাও আমি আসছি, বিচারককে তোমরা এসে জমায়েত হও। কথাগুলো দস্যুরাণী রাগতভাবেই বললো।

চলে গেলো অনুচরটা, তার বুকটা ধক ধক করছে। দস্যুরাণী ক্রুদ্ধভাব লক্ষ্য করে মনে মনে শিউরে উঠলো সে।

অনুচরটা চলে গেলো, বললো চন্দনা–রাণী, বনহুর যা বলে গেলো মিথ্যা নয়, কারণ অনুচরদের কোনো অপরাধ নেই, অপরাধ দস্যু বনহুরের তার মত বুদ্ধিমান দস্যু..

রাগের আতিশয্যে মাটিতে পদাঘাত করে বলে উঠলো, দস্যুরাণী–চন্দনা, চুপ কর আমি দস্যু বনহুরের বুদ্ধিদীপ্তের পরিচয় ধূলিসাৎ করে দেবো, আমাকে সে জানে আমি নারী, তাই তার এত অহঙ্কার। চল আমি সমুচিত শাস্তি দেবো আমার অনুচরদের।

চন্দনা আর কোনো কথা বলতে পারলো না, সে নীরবে অনুসরণ করলো দস্যুরাণীকে।

আজ দস্যুরাণীকে ভীষণ রুদ্রমূর্তি দেখাচ্ছে।

আসনের সম্মুখে পায়চারী করছে সে। তার ভারী বুটের শব্দ পাষাণ দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

চন্দনা দাঁড়িয়ে আছে, মুখখানা তার নিষ্প্রভ।

অন্যান্য অনুচর সবাই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে, সবার মুখই ভয়ে পাংশুবর্ণ ধারণ করছে। বুক দুরু দুরু করে কাঁপছে, কারণ তাদের রাণীজীকে তারা এমনভাবে কোনোদিন ক্রুদ্ধ হতে দেখেনি।

গর্জে উঠল দস্যুরাণী–জবাব দাও কি করে দস্যু বনহুর পালালো এবং সে শুধু নিজে পালায়নি, তার স্ত্রীকেও সে যাবার সময় সচ্ছন্দে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

এক প্রবীণ অনুচর মাথা উঁচু করে কথা বললো–রাণীজী, আপনিও জানেন দস্যু বনহুর সাধারণ ব্যক্তি নয়। তার সীমাহীন শক্তি.......

আবার সেই কথা–পুরোনো প্রলাপ…সীমাহীন শক্তি–সীমাহীন শক্তি…..সীমাহীন শক্তিকে আমি নিমিষে ধ্বংস করে দিতে পারি জানো?

রাণীজী, আপনি যেমন বিশ্ববিখ্যাত দস্যুরাণী তেমনি বিশ্ববিখ্যাত……

প্রবীণ অনুচরটার কথার মাঝখানে বলে উঠলো দস্যুরাণী–বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনহুর আমি স্বীকার করি না। শুধু সে তোমাদের নির্বুদ্ধিতায় পালাতে সক্ষম হয়েছে। একবার নয়, দু'বার সে আমাকে অপমান করলো। হাঁ, আমি তাকে কিছুতেই ক্ষমা করবো না।

রাণীর কথায় কেউ কোনো কথা বলতে সাহসী হলোনা।

দস্যুরাণী পূর্বের ন্যায় ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল–আমি তোমাদের প্রত্যেককে শাস্তি দেবো, চরম শাস্তিযে। শাস্তির কথা তোমরা কোনোদিন ভুলতে পারবে না।

চন্দনা বললো–বাণী, এবারের মত ক্ষমা করে দাও।

না, আমি এবার কাউকে ক্ষমা করবো না, বিশেষ করে যারা বনহুরের কারাকক্ষের পাহারায় ছিলো তাদের। ……কথাগুলো কঠিন কণ্ঠে বলে বেরিয়ে গেলো দস্যুরাণী।

চন্দনা নির্বাক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

অনুচরগণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলো এতক্ষণ, এবার তারা চোখ তুলে তাকালো চন্দনার দিকে।

চন্দনা জানে রাণীর কথা বা নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য কারও নেই। শাস্তি তাদের পেতেই হবে।

প্রবীণ অনুচরটা বলে উঠলো–আমাদের উপর এই শাস্তি দান সম্পূর্ণ ভুল হবে।

আমি জানি কিন্তু কোনো উপায় নেই, শাস্তি তোমাদের গ্রহণ করতেই হবে।

বনহুরের জন্য দস্যুরাণী তার অনুচরদের কঠিন শাস্তি দিলো। সবাইকে চোখ বেঁধে পাহাড় থেকে নিচে নামার নির্দেশ দেওয়া হলো। যে সুষ্ঠুভাবে নামতে পারলো সে জীবনে রক্ষা পেলো, আর যে গড়িয়ে পড়লো সে মৃত্যুবরণ করলো। যখন

একজন করে গড়িয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করছে, তখন দস্যুরাণী একটি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে হাঃ হাঃ করে হাসছিলো।

চন্দনা এসে দাঁড়ালো দস্যুরাণীর পাশে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে আরও একজন অনুচর চোখ বাঁধা অবস্থায় গড়িয়ে পড়ে দস্যুরাণীর পায়ের কাছে। সমস্ত মাথাটা তার থেতলে গেছে, রক্তে ভিজে গেলো দস্যুরাণীর পায়ের কাছে শুকনো মাটি।

দস্যুরাণী হেসেই চলেছে তখনও।

চন্দনা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো–রাণী, তুমি একি নৃশংস আচরণ শুরু করেছ?

তখনও দস্যুরাণীর হাসি থামে নি। হেসেই চলেছে সে অদ্ভুতভাবে।

চন্দনা পুনরায় ডাকলো–রাণী, এ তুমি কি করছো? এমন পাষাণ হলে কি করে?

ততক্ষণে চোখ বাঁধা অবস্থায় অনুচরটার দেহ দস্যুরাণীর পায়ের কাছে স্থির হয়ে গেছে। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে তার। চন্দনার ডাকে হাসি থামিয়ে ফিরে তাকালো দস্যুরাণী।

চন্দনা বললো–রাণী, একি করছো তুমি!

অনুচরদের কাজের উপযুক্ত বিচার করছি।

রাণী, তুমি ভুল করছে।

না, ভুল আমি করিনি।

তুমি জানো দস্যু বনহুরকে বন্দী করে রাখা সহজ নয়।

আমি বিশ্বাস করি না।

প্রথম যেবার তুমি তাকে আটক করেছিলে সেবারও সে কেমন কৌশলে পালিয়েছিলো। তোমার প্রহরীরা কেউ তাকে আটকে রাখতে পারেনি। এবারও তারা পারলো না। রাণী, তাই বলে তুমি এত হৃদয়হীন হবে? তোমার অনুচরগণ

এমনিভাবে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে মরবে আর তুমি তা দেখে হাসবে? পৈশাচিক তোমার এ হাসি!

চন্দনা, তুই চুপ কর আমি সত্যিই হৃদয়হীন পিচাশিনী।

দস্যুরাণী এগিয়ে চললো তার আস্তানার দিকে।

চন্দনা তাকে অনুসরণ করলো।

*

অশ্বপৃষ্ঠ থেকে বনহুর মনিরার সংজ্ঞাহীন দেহটা নামিয়ে নিলো হাতের উপর। তারপর তাকে নিয়ে চললো আস্তানার ভিতরে। পিছনে নূরী আর নাসরিন। পাশে রহমান এবং আরও দু'জন অনুচর। সবাই তারা বনহুরের সঙ্গে আস্তানার দিকে এগুলো।

বনহুর যখন আস্তানায় প্রবেশ করে নিজের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করলো তখন রহমান ও অনুচরদ্বয় বাইরে দাঁড়িয়ে পড়লো।

কারও মুখে কোনো কথা নেই।

বনহুর নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলো মনিরাকে!

নূরী এতক্ষণে বললো–মনিরা আপার কি হয়েছে! তাকে এখানে নিয়ে এলে কেন?

বনহুর ফিরে তাকালো নূরীর দিকে, গম্ভীর কণ্ঠে বললো–তোমার কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে নূরী।

ছিঃ ছিঃ আমার অসুবিধা হবে কেন? আমি জিজ্ঞাসা করছি মনিরা আপামনির কি হয়েছে?

সব পরে বলবো, এখন তোমরা সরে যাও।

নুরী আর নাসরিন বেরিয়ে গেলো বনহুরের বিশ্রামকক্ষ থেকে। বনহুরের কথাগুলো আজ তাদের মোটই ভাল লাগলো। না। নূরীর চোখ দুটো ছলছল করে

উঠলো। অভিমানে রাঙা হয়ে উঠলো তার মুখমন্ডল।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই রহমান ও অনুচরদ্বয় কিছুটা অবাক হলো নূরী আর নাসরিনের মুখোভাব লক্ষ্য করে। নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটেছে যার জন্য নূরীর চোখ ছলছল হয়ে এসেছে।

রহমান বললো–কি হলো, বৌরাণী এখন কেমন?

নূরী অভিমানভরা গলায় বললো–জানি না।

রহমান তাকালো এবার নাসরিনের মুখের দিকে, প্রশ্নভরা তার দৃষ্টি

নাসরিন বললো–নূরী সর্দারকে জিজ্ঞাসা করেছিলো মনিরা আপামনির কি হয়েছে? জানো সর্দার তার জবাবে কি বললো?

কি বললো?

বললো সব পরে বলবো, এখন তোমরা সরে যাও। সত্যি, সর্দার নূরীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে ভাবতে পারিনি।

রহমান আনমনা হয়ে গেলো, বললো সে নিশ্চয়ই এমন কোনো কারণ ঘটেছে যা চট করে বলা সম্ভব নয় তা ছাড়া হয়তো ঐ সময় সেখানে তোমাদের উপস্থিতি ভাল নয় তাই……

চুপ করো রহমান, আমি বুঝতে পেরেছি সর্দার আমাকে আর চায় না। আমি সরে গেলে সে খুশি হয়…..

অহেতুক তুমি রাগ করছে নূরী, শোন……

না, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না! কথাটা বলে চলে গেলো নুরী নিজের ঘরের দিকে।

কতদিন হলো নাসরিন কন্যাশোকে পাগলিনী প্রায়, তবু যে নূরীর ব্যথা সহ্য করতে পারে না। নূরী চলে গেলো বলে সেও চলে গেলো নূরীর কক্ষে।

রহমানের ইচ্ছা থাকলেও নূরী আর নাসরীনকে অনুসরণ করতে পারলো না, সে বনহুরের বিশ্রামকক্ষের দরজায় দন্ডায়মান রইলো। কখন কি প্রয়োজন হয় কে জানে!

নূরী অভিমানে মুখ ভার করে বসে পড়লো গিয়ে নিজের বিছানায়।

নাসরিন বসলো গিয়ে তার পাশে।

চির উচ্ছল নুরীর ছলছল আঁখি মোটেই ভাল লাগে না নাসরীনের কাছে। কতদিন হলো সে ফুল্লরাকে হারিয়েছে তবু বেঁচে আছে নাসরীন। শুধু নূরীর সান্নিধ্য তাকে ফুল্লরার হারানো বেদনাকে ভুলিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। আজ সেই নূরীকে গম্ভীর হতে দেখে মনটা তার ব্যথায় ভরে উঠলো।

নাসরিনের মাঝে মাঝে রাগ হতে সর্দারের উপর, কারণ সর্দার জানতো নুরী তাকে হোটবেলা থেকেই ভালবাসে, তবু কেন সে শহরে মেয়ে মনিরাকে বিয়ে করলো? নাসরিন প্রায়ই রহমানকে বলতো, তোমরা পুরুষের জাত বড় হৃদয়হীন। নূরী সর্দারের ছোটবেলার সাথী। সব সময় ওর সঙ্গে খেলাধূলো করেছে, নদীর পানিতে সাঁতার কেটেছে, পর্বতের চূড়ায় চূড়ায় ঘুরে বেরিয়েছে, বনে বনে শিকার করে ফিরেছে, তবু সর্দার নূরীকে ভাল না বেসে বাসলো মনিরাকে। তুমি না ধরলে কিছুতেই সর্দার নূরীকে বিয়ে করত না, এটা সত্য।

নাসরিনের কথায় বলতো রহমান–সর্দারকে দোষারোপ করো না নাসরিন। বৌরাণী সর্দারের শিশুবেলার সাথী আর নূরী ছোটবেলার সঙ্গী। তা ছাড়াও সর্দারের বাবা–মা মনিরাকে পুত্রবধু করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বৌরাণীর মায়ের কাছে।

ভালবাসা আর প্রেমের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় বাপ–মার প্রতিশ্রুতি। মনিরা আপামনির ভালবাসার চেয়ে অনেক বেশি নূরীর প্রেম–ভালবাসা।

স্বীকার করি, নুরী সর্দারকে গভীরভাবে ভালবাসে কিন্তু বৌরাণীও সর্দারকে কম ভালবাসে না। তার ভালবাসাও অত্যন্ত গভীর, এ কথা ভুলে যেও না নাসরিন।

এমনি নানা ধরনের তর্ক–বিতর্ক চলতো প্রায়ই রহমান ও নাসরিনের মধ্যে। রহমান কোনোদিন পরাজয় বরণ করেনি নাসরিনের কাছে।

নাসরিনও হার মানতে চাইতো না, সে বলিষ্ঠ কণ্ঠে জানাতো তার কথাই সত্য, নূরীই সর্দারকে বেশি ভালবাসে। আর রহমান বলতে বৌরাণীর ভালবাসাও কম নয় নূরীর চেয়ে।

রহমান মুখে যাই বলুক সে জানতো এবং বুঝতে নূরীর ভালবাসা বৌরাণীর চেয়ে মোটেই কম নয়। সর্দারকে এই নারী দুটি সমানভাবে ভালবাসে এবং কামনা করে।

আজ নূরীর মনে বনহুরের কথাটা দারুণভাবে আঘাত করে। সে নিজকে কিছুতেই সংযত রাখতে পারছিলো না।

নাসরিন বুঝতে পারে নূরীর ব্যথা কত গভীর, তাই সে ব্যথিত হয় এবং ভুলে যায় নিজ কন্যা ফুলরার কথা। নূরীর দুঃখ তাকে বিচলিত করে, বলে সে–নূরী আমি ভেবে পাচ্ছি না সর্দার কি করে এমন কঠিন হলো!

আমিও তাই ভাবছি নাসরিন। আমার হুর কোনোদিন এমন ছিলো না। কথাটা বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো নূরী।

নাসরিন বললো–সর্দারের আচরণ এমন তো ছিলো না কোনোদিন। বৌরাণীর কি হয়েছে সে কথাটাও সে বললো না তোমাকে।

হাঁ, সেটাই আমার দুঃখ নাসরিন। জানিস আমি মনিরা আপাকে কত ভালবাসি, কত শ্রদ্ধা করি।

জানি নুরী–জানি, তুমি না বুঝে মিছামিছা রাগ করছ!

চমকে ফিরে তাকালো নাসরিন, দেখতে পেলো সর্দার দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে।

নাসরিন উঠে দাঁড়ালো নত মস্তকে।

বনহুর এগিয়ে এলো নূরী পাশে। ওর কাঁধে হাত রেখে বললো–মনিরার সংজ্ঞা এখনও ফিরে আসেনি। ফিরবে কিনা সন্দেহ জাগছে……একটু থেমে বললো বনহুরমূরী, তুমি জানো না, মনিরাকে। দস্যুরাণী অজ্ঞান করে তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলো। আমাকেও সে বন্দী করেছিলো……

কথাটা শুনে ফিরে তাকায় নূরী বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর বলে–তোমার সঙ্গে যখন ওয়্যারলেসে কথা বলছিলাম তখন পাহাড়ের উপরে বসে ছিলাম, তার পূর্বেই মনিরা চুরি হয়ে গেছে...

নূরীর রাগত ভাব ধীরে ধীরে মুছে যায়, সে উঠে দাঁড়িয়ে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকে বনহুরের কথাগুলো।

নাসরিনও শুনছিলো সর্দারের কথাগুলো।

বনহুর সংক্ষেপে সব কথা বলে যায় নূরীর কাছে। আরও বলে সে, মনিরার সংজ্ঞা ফিরে এলে তোমাকে সাবধানে থাকতে হবে, কারণ এখনও সে জানে না তোমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ। কাজেই মনিরার সংজ্ঞা ফিরে এলে তোমাকে সরে থাকতে হবে, কারণ তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

আমি জানি হুর, সব জানি। মনিরা আপাকে এখানে এনেছে সেজন্য আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। বেশ, তুমি যা বলবে আমি তাই করবো।

আপাততঃ তুমি মনিরার সম্মুখে যাবে না। মনিরা সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে আত্নগোপন করে থাকতে হবে। নূরী, এটুকু পারবে না তুমি?

তোমার সুখের জন্য, তোমার মঙ্গলের জন্য আমি সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করতে পারি। তুমি বলো আমাকে কোথায় যেতে হবে?

কোথাও যেতে হবে না, এই আস্তানায়ই থাকবে তবে মনিরার সামনে যেও না। সত্যি নূরী তুমি বিশ্বাস করো আমি বহুদিন মনিরাকে তোমার সম্বন্ধে সব কথা বলতে চেয়েছি কিন্তু সে সব সময় এড়িয়ে গেছে বা এড়িয়ে যায়, তাই আমি তোমাকে নিয়ে কিছু বলতে পারিনি তার কাছে!

বনহুরের কথা শেষ হয় না, রহমান এসে হাজির হয়। ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠলো–সর্দার, বৌরাণীর জ্ঞান ফিরে এসেছে।

নূরী বলে উঠলো–যাও হুর, যাও দেরী করো না।

নাসরিন পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালো।

বনহুর বেরিয়ে গেলো।

রহমান তাকে অনুসরণ করলো।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করে দেখলো মনিরা বিছানায় উঠে বসেছে, সে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক।

বনহুর ডাকলো–মনিরা!

মনিরা ফিরে তাকাতেই তার চোখ দুটো উচ্ছল আনন্দে ভরে উঠলো। বললো মনিরা–আমি কোথায় এসেছি।

বনহুর মনিরার পাশে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত রেখে বললো, চিন্তার কোনো কারণ নেই মনিরা, তুমি আমার আস্তানায়।

মনিরা চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে–আমি এখন কি তোমার আস্তানায়?

হা মনিরা।

বহুরের বুকে মাথা গুঁজে বলে মনিরা–কি করে এখানে এলাম? আমার কিছু মনে পড়ছে না।

সব তোমাকে বলবো মনিরা, এখন তুমি বিশ্রাম করো, কারণ তুমি অত্যন্ত অসুস্থ।

কি হয়েছিলো আমার?

তুমি জানোনা মনিরা তোমার কি হয়েছিলো?

ঠিক স্মরণ করতে পারছি না।

তুমি এখন শোও মনিরা। আমি তোমাকে সব বলবো। বনহুর নিজে মনিরাকে শুইয়ে দেয়, তারপর চুলগুলো কপাল থেকে সরিয়ে দিয়ে বলে দস্যুরাণী তোমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলো আর আমাকে করেছিলো আটক……

বলো কি!

হাঁ মনিরা।

কৌশলে আমি নিজে মুক্ত হয়েছি এবং তোমাকে উদ্ধার করেছি। তবে সব কৃতিত্ব তাজের। তাজ ঠিকমত কাজ করতে না পারলে পুনরায় বন্দী হতাম। তোমাকেও দস্যুরাণীর কবল থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হতো না।

হাঁ, হাঁ....আমার মনে পড়ছে। তুমি তাজের সন্ধানে পাহাড় থেকে নিচে নেমে গেলে, আর আমি বসে রইলাম ঠিক যেখানে তুমি আমাকে থাকতে বলেছিলে সেখানে। তুমি চলে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ গন্ধ ভেসে আসলো, ভারী সুন্দর গন্ধ, আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম এবং বুঝতে চেষ্টা করলাম, এ গন্ধ কোথা থেকে আসছে। জানা তারপর কখন কি হলো আমি জানি না...আনমনা হয়ে গেলো মনিরা, একটু থেমে বললো–এখন দেখছি তোমার আস্তানায়। জানিনা কতক্ষণ সংজ্ঞা হারিয়ে ছিলাম।

বললো বনহুর–দীর্ঘ সময় তুমি সংজ্ঞাহীন ছিলে।

তবু বলোনা।

কমপক্ষে তিনদিন।

বলো কি?

হাঁ, মনিরা, দস্যুরাণী তোমাকে এমন ওষুধ দ্বারা অজ্ঞান করেছিলো যার জন্য তিন দিন তোমার জ্ঞান ফিরে আসেনি। যাক ও সব কথা, তুমি এখন ঘুমাও।

না, আর আমি ঘুমাবো না, অনেক ঘুমিয়েছি।

বনহুর টেবিলে রাখা কলিং বেলে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে একজন পরিচারিকা এসে দাঁড়ালো সেখানে।

বনহুর বললো–দুধ নিয়ে এসো।

চলে গেলো পরিচারিকা।

বনহুর মনিরার হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বললো–এখন কেমন বোধ করছে মনিরা?

ভাল! সত্যি এটা তোমার আস্তানা

কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?

জানি না তুমি আমাকে ধোকা দিচ্ছে কিনা?

মনিরা তোমাকে আমার আস্তানায় নিয়ে আসতে পেরেছি, এটা আমারও কম সৌভাগ্য নয়।

এমন সময় পরিচারিকা সুন্দর ট্রের উপর রৌপ্যনির্মিত গেলাসে দুধ নিয়ে হাজির হলো। এগিয়ে ধরলো সে বনহুর আর মনিরার সম্মুখে।

মনিরা পরিচারিকার বেশভূষা আর সৌন্দর্য লক্ষ্য করে অবাক হলো। সত্যি অপূর্ব বটে। পরিচারিকা দুধের গেলাস সহ ট্রেটা নামিয়ে রাখলো টেবিলে, তারপর বেরিয়ে গেলো।

বনহুর দূরের গেলাসটা তুলে নিয়ে মনিরার মুখের কাছে তুলে ধরলো–খাও মনিরা।

মনিরা অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ করছিলো, সে না খেয়ে পারলো না। দুধ খেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করলো। মনিরা।

এমন সময় রহমান এক ঝাঁকা ফল এনে রাখলো সম্মুখের টেবিলে–সর্দার, ফল এনেছি।

বনহুর বললো–বাঃ! ভারী সুন্দর ফলতো, কোথায় পেলে রহমান?

কায়েস এনেছে। বললো রহমান।

বনহুর একটা ফল তুলে নিয়ে ছুরি দিয়ে কেটে নিজে খেতে লাগলো এবং মনিরার মুখে তুলে দিতে লাগলো।

রহমান কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর ফল চিবুতে চিবুতে বললো–মনিরা, বিশ্বাস হলো তো এটা আমার আস্তানা?

মনিরা কোনো জবাব দিলো না, তার মুখমন্ডলে একটা প্রসন্ন ভাব ফুটে উঠলো।

কয়েক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো মনিরা। উচ্ছল আনন্দে ভরে উঠলো তার মন। স্বামীর আস্তানায় এসেছে, এ তার পরম সৌভাগ্য।

বনহুর এক সময় মনিরাকে বলেছে মনিরা, তোমার জন্য এ জায়গা নয়, কাজেই তুমি এখানে সংযতভাবে থাকবে। এটা দস্যুর আড়াখানা, বুঝলে?

মনিরা বলেছে, হাঁ, তাই হবে, আমি তোমার বিনা অনুমতিতে কোথাও যাবো না।

বেশ, তাই করো, কোথাও যেও না।

তবু তো তোমায় সর্বক্ষণ পাশে পাবো বলেছিলো মনিরা।

বনহুর শুধু একটু হেসেছিলো।

সত্যিই মনিরা আস্তানায় সংযতভাবেই রয়েছে। সে বাইরে যায় না, সব সময় তার পরিচিত জায়গার মধ্যেই চলাফেরা করে। এসব জায়গায় বনহুর তাকে যেতে বলেছে, কাজেই তার কোনো অসুবিধা হয় না।

তেমনি অনুচরদেরকেও বারণ করে দিয়েছে তারা যেন মনিরার গন্ডিসীমার মধ্যে না যায়। মনিরা তার স্ত্রী হলেও সে তার দস্যু–জীবনের কার্জকর্মের সঙ্গে পরিচিত নয়।

নূরী আর নাসরিন রহমানের নির্দেশে মনিরার সম্মুখে আসেনি, তারা আত্মগোপন করে আছে আস্তানা অভ্যন্তরে। এমন কি কোনো অনুচরও ভুল করেও প্রবেশ করে না বনহুরের বিশ্রামকক্ষের দিকে।

তবে রহমান মাঝে–মধ্যে প্রয়োজনবোধে আসে মনিরার পাশে। মনিরা রহমানকে তার সব কথা বলে, এমনকি কান্দাই শহরে গিয়ে মামীমার খোঁজখবর পর্যন্ত আনার জন্য নির্দেশ দেয়।

রহমান বৌরাণীর কোনো কথা অবহেলা করতে পারে না, সে অশ্ব নিয়ে শহরে যায় এবং চৌধুরীবাড়ির সমস্ত সংবাদ নিয়ে আসে।

সেদিন রহমান এলো, কুর্ণিশ জানালো সে বৌরাণীকে।

মনিরা বললো–রহমান, আস্তানার বাইরে যেতে চাই, আমাকে নিয়ে চলোনা?

বললো রহমান–বেশ, সর্দারকে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে যাবো।

বললো মনিরা–আমি কিন্তু কারও বারণ শুনবো না। আমার অনেক দিনের সখ কান্দাই জঙ্গল দেখা। সুযোগ যখন এসেছে তখন যাবোই।

আচ্ছা বৌরাণী।

চলোনা আজ আস্তানার ভিতরটা দেখি।

রহমান চট করে জবাব দিতে পারলো না, সে মাথা চুলকাতে শুরু করলো, এমন সময় পিছনে এসে দাঁড়ায় বনহুর–বেশতো, যা দেখতে চাও দেখো। এখনও তোমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। কাজেই আর ক'দিন অপেক্ষা করো, আমি নিজে তোমাকে সমস্ত আস্তানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাবো।

তুমি তো বলছো আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ নয় কিন্তু আমি তো বেশ সুস্থ বোধ করছি।

রহমান বললো–বৌরাণী, আপনি আমাদের আস্তানা ঘুরে ফিরে দেখবেন এটা পরম আনন্দের কথা। কিন্তু হঠাৎ আপনি যাবেন এতে আমাদের অনুচরগণ বিব্রত বোধ করবে, কাজেই পূর্ব হতে সবাইকে বলে রাখবো, তারপর আপনি আস্তানা ইচ্ছামত দেখবেন তাতে কারো কোনো অসুবিধা হবে না।

বনহুর বললো–হাঁ, রহমান ঠিক কথা বলেছে।

মনিরা বললো–রহমান, তাহলে কালকেই আমি তোমাদের গোটা আস্তানা ঘুরেফিরে দেখবো, তুমি তোমাদের লোকজনদের বলে রাখবে।

বেশ, তাই হবে। রহমান, তোমাদের বৌরাণী যা বললো সেভাবে কাজ করবে।

আচ্ছা সর্দার।

রহমান বনহুর আর মনিরাকে কুর্ণিশ জানিয়ে চলে গেলো।

বনহুর মনিরাকে সঙ্গে করে মুক্ত জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো। এখান থেকে আকাশ এবং জঙ্গলের কিছু অংশ নজরে পড়ে! আরও দেখা যায় কান্দাই পর্বতমালার চুড়া।

বনহুর বললো–মনিরা, কবে ফিরে যাবে বলো তো? মা নিশ্চয়ই তোমার জন্য ভাবছেন।

মনিরা বললো–না, মামীমা আমার জন্য মোটেই ভাবছেন না, কারণ তিনি জানেন আমি তোমার সঙ্গে আছি।

তিনি জানেন সে কথা আমি মানি, কিন্তু বেশকিছুদিন গড়িয়ে গেলো, হয়তো এখন তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তিনি জানেন তার সন্তানের উপর ভরসা করা চলে না।

ছিঃ মামীমা কোনোদিন এমন চিন্তা মনেও স্থান দেন না। তোমার উপর তার অনেক ভরসা।

কিন্তু

কোনো কিন্তু নয়। শোন আমি যে তোমার আস্তানায় আছি, একথা আমি মামীমাকে জানিয়ে দিয়েছি, কাজেই তুমি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

মাকে জানিয়েছো তুমি আমার আস্তানায় আছো?

হাঁ, রহমানকে পাঠিয়েছিলাম কান্দাই শহরে।

মা কেমন আছে?

তিনি ভাল আছেন।

তবে তোমাকে না দেখে নিশ্চয়ই..

আমাকে দেখার চেয়ে তোমাকে কাছে পাবার জন্য মামীমা ভীষণ উতলা আছেন।

সত্যি, কতদিন হলো মার কাছে যেতে পারিনি। মনটা আমার মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে উঠে। মনিরা, পুলিশমহল যেভাবে আমার পিছু নিয়েছে তাতে মায়ের পাশে যাবো তা যেন ভাবতে পারি না! মার কথা মনে হলে কিছু ভাল লাগে না মনিরা।

জানি মামীমার যেমন ব্যথা তোমার জন্য তেমনি তার জন্য তোমার কষ্ট। নূর বিদেশ যাবার পর থেকে মামীমা আরও উদাসিনী হয়ে পড়েছেন। তুমি তো পাশে থাকোনা বা দেখোনা, নাওয়া খাওয়া সব কিছুতেই তার সেই পূর্বের আগ্রহ নেই।

আমি সব জানি মনিরা, নুর তিন বছর হলো বিদেশে গেছে, এর মধ্যে আমি তিনবারও মার পাশে যেতে পারিনি। শুনেছি নূর প্রায়ই তোমাদের কাছে চিঠি লিখে। পড়াশোনায় সে অনেক ভাল করেছে। সত্যি মন আমার আনন্দে ভরে যায়।

নুরকে তোমার দেখতে ইচ্ছে করেনা?

করে, কিন্তু উপায় কই যে গিয়ে দেখে আসবো।

দস্যুসম্রাটের আবার উপায়! আমি জানি ইচ্ছা করলেই তুমি গিয়ে নূরকে দেখে আসতে পারো।

তুমি যদি বলো তবে যাবো মনিরা, গিয়ে নূরকে দেখো আসবো। কিন্তু একটা দুশ্চিন্তা আমাকে অস্থির করে তুলেছে……

দুশ্চিন্তা!

হাঁ!

কিসের দুশ্চিন্তা তোমার?

মনিরা, আমার আস্তানায় একটা মেয়েশিশু ছিলো, নাম তার ফুল্লরা। আমি তাকে বড় আদর করতাম…সেই মেয়েটি হারিয়ে গেছে।

হারিয়ে গেছে।

হাঁ, কে বা কারা তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

একটি মেয়ে হারিয়ে গেছে–তাকে তুমি ভালবাসতে, আদর করতে অথচ তুমি নীরব আছো?

না, নীরব ঠিক নেই...একটু থেমে বললো বনহুর–আমি জানি যারা বা যে ফুল্লরাকে চুরি করে নিয়ে গেছে সে বা তারা ওর কোনো ক্ষতি করবে না মানে ওকে হত্যা করবে না।

সেই বিশ্বাস নিয়ে তুমি নিশ্চুপ আছো?

বললাম তো নিশ্চুপ সেই আমি! তবে মনে রেখো মনিরা, ফুল্লরাকে যে বা যারা চুরি করে নিয়ে গেছে। তাদের আমি নিশ্চিহ্ন করে দেবো এ পৃথিবীর বুক থেকে। তারা জানে না হয়তো ফুল্লরাকে চুরি করার অপরাধ কত শাস্তিজনক। কথাগুলো বলতে গিয়ে বনহুরের মুখমন্ডল কঠিন হয়ে উঠলো।

মনিরা স্বামীর মন থেকে ফুল্লরার চিন্তা দূর করার জন্য বললো–চোনা তোমার স্নানাগারে যাই।

স্নানাগারে যাবে?

হাঁ, তোমার স্নানাগার নাকি ভারী সুন্দর?

কে বললো তোমাকে এ কথা?

রহমান বলেছিলো সে অনেকদিন আগে। তার সঙ্গে একদিন কান্দাই নিউ গার্ডেনে বেড়াতে গিয়েছিলাম সেখানে নিউ গার্ডেনের স্নানাগার দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। রহমান আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বলেছিলো–বৌরাণী, নিউ গার্ডেনের স্নানাগার দেখে আপনি মুগ্ধ হয়েছেন, এর চেয়ে শতগুণ সুন্দর মনোমুগ্ধকর সর্দারের স্নানাগার! আমি সেই থেকে তোমার স্নানাগার দেখার লোভ মনে মনে পোষণ করে আসছিলাম। নিয়ে চলোনা আমাকে?

বেশ, চলো।

বনহুর আর মনিরা এগুলো স্নানাগারের দিকে।

জাভেদ তীরধনু হাতে দৌড়ে যাচ্ছিলো, হঠাৎ তাদের সম্মুখে পড়ে যায় সে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে জাভেদ।

মনিরার দৃষ্টি জাভেদের উপর পড়তেই ভীষণভাবে চমকে উঠলো, বললো–এই ছেলেটি কে?

বনহুর কি জবাব দেবে ভেবে পেলো না, তবু সে নার্ভাস হবার বান্দা নয়, বললো–আমার আত্নীয়.......

ঠিক নূরের চেহারা আমি দেখতে পাচ্ছি! গম্ভীর কণ্ঠে বললো মনিরা।

নূর...হাঁ, কতকটা নূরের মতই চেহারা জাভেদের। কথাটা বলে বললো বনহুরাও জাভেদ, তুমি কোথায় যাচ্ছিলে, যাও।

জাভেদ কতকটা অবাক হয়ে গেছে পিতার কথায়। তাকে আত্নীয় বলে পরিচয় দিলো কেন আর তাড়াতাড়ি চলে যেতেই বা বললো কেন। মেয়েটি কে, যার সঙ্গে তার বাপুর এমন ঘনিষ্ঠতা......জাভেদ একবার পিতার মুখে তাকিয়ে দেখলো, তারপর মনিরার দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখে চলে গেলো সেখান থেকে।

জাভেদ সেখান থেকে সরে গেলেও সে আর তখন শিকারে গেলোনা। সোজা সে নুরী আর নাসরিন যেখানে এসেছিলো সেখানে গিয়ে হাজির হলো। জড়িয়ে ধরলো মাকে–আম্মু, বলো, আব্বুর সঙ্গে মেয়েটা কে?

মনিরার কথাই বলছে জাভেদ বুঝতে পারলো নূরী এবং নাসরিন।

নূরী কি জবাব দেবে ভেবে পেলো না চট করে।

নাসরিন বললো–তোমার আম্মুর বোন!

আম্মুর বোন?

হাঁ, তোমার আম্মুর বোন।

আমি তো তাকে দেখিনি কোনোদিন?

তা দেখবে কেমন করে, সে তো আর এখানে থাকে না। বললো নাসরিন।

জাভেদ কিন্তু তখনও মায়ের হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে আছে, বললো–আম্মু, তোমার বোন তবে তোমার মত নয় কেন? তুমি ঘাগড়া, পরো বিনুনী করে চুল দু'পাশে ঝুলিয়ে রাখো আর তোমার বোন শাড়ি পরে, চুল খোঁপা করে বাধে, সম্পূর্ণ আলাদা যে তোমার চেয়ে

বললে নূরী–বোন হলেই কি এক রকম হয়। তবে বোন হলেও দুজনের বাবা–মা আলাদা, বুঝলে? আমার আত্নীয়া, দূল সম্পকের বোন।

আম্মু, তোমার কথাও যেমন, তেমনি আব্বুর কথা। তোমার বোন যখন আব্বুকে জিজ্ঞাসা করলো, এই ছেলেটা কে? আব্ব কি বললো জানো

একসঙ্গে বলে উঠলো নূরী আর নাসরিন–কি বললো তোমার আব্বু?

জাভেদ পিতার মত গলার স্বর গম্ভীর করার চেষ্টা করে বললো–আমার আত্নীয়!

নূরী আনমনা হয়ে গেলো।

নাসরিন বললো–সন্তান তো আত্নীয়ই বাবা। তোমার আব্বু ঠিকই বলেছে।

জানো আম্মু, তোমার বোন আরও কি বললো?

কি বললো? প্রশ্ন করলে নূরী।

নাসরিনের চোখেও প্রশ্নভরা দৃষ্টি।

জাভেদ বিশেষ ভঙ্গিমায় বললো–তোমার বোন আমার দিকে তাকিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্য করে বললো–ঠিক নূরের চেহারা আমি দেখতে পাচ্ছি......

এ্যা, কি বললে? নূরীর চোখেমুখে বিস্ময়ভরা ভাব ফুটে উঠলো।

নাসরিনও একটা শব্দ করে উঠলো–কি বললো সে?

কেন, তোমরা কি কানে শুনতে পাচ্ছো না? বললো জাভেদ।

বললো নাসরিন আজ যেন কেমন একটু কানে কম শুনতে পাচ্ছি আমরা।

তুমিও কানে কম শুনতে পাচ্ছো নাসরিন খালা?

হাঁ জাভেদ।

আচ্ছা আম্মু, নূর কে?

সে তোমার আব্বুর আত্নীয় তুমি ঠিক সেই নূরের মত দেখতে হয়েছে, তাই বলেছো।

ও……এতক্ষণে জাভেদ যেন সবকিছু বুঝতে পারলো। সে আর দাঁড়ালো না, এবার ছুটলো তীরধনু হাতে নিয়ে বাইরের দিকে।

জাভেদ চলে গেলো।

নূরী আনমনাভাবে তাকিয়ে আছে, জাভেদের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে হয়তো তার মনে পড়েছে নূরের কথা।

একদিন নূরীর হৃদয়ের ধন ছিল নূর। অবশ্য নূরী তাকে মনি বলে ডাকতো। স্বামীর হুবহু চেহারা ছিলো নূরের চেহারার মধ্যে–তাই নূরী ওকে এত গভীরভাবে স্নেহ করতো, ভালবাসতো।

নাসরিন নূরীর কাঁধে হাত রেখে বললো–কি ভাবছো নূরী

নূরীর সম্বিৎ ফিরে এলো, সে বললো–ভাবছি হুর এমন করে কতদিন মনিরার কাছ থেকে আমাকে লুকিয়ে রাখবে।

নাসরিন বললো–শুনেছি, সর্দার মনিরার আপাকে তোমার কথা সব খুলে বলতে চায় কিন্তু মনিরা আপা তাকে বলার সুযোগ দেয় না।

এ কথা তুই বিশ্বাস করলেও আমি বিশ্বাস করি না। কারণ হুর তার কাছে তেমন করে বলতেই পারেনি বা পারবে না। হয়তো বলতে চেয়েছে কিন্তু সাহস পায় নি।

নূরী, তুমি কি বলতে চাও সর্দার ইচ্ছা করেই তোমার আসল পরিচয় মনিরা আপনার কাছে গোপন রেখেছে?

হাঁ।

কারণ

কারণ সে যত শক্তিশালী বীরপুরুষই হোক না কেন, মনিরা আপনার কাছে মেশশাবকের মত দুর্বল।

রাগতভাবে বললে নূরী–তুই জানিস না নাসরিন, হুর ইচ্ছা করেই ব্যাপারটা গোপন রেখেছে……

তোমার ধারণা ভুল নূরী!

চমকে ফিরে তাকালো নাসরিন আর নূরী!

তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে বনহুর।

এগিয়ে এলো সে নূরীর পাশে।

নুরী বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরলো–আজ তোমাকে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে? ঝাঁকুনি দিলো সে ভীষণ জোরে।

নাসরিন ঐ সুযোগে সরে পড়লো সেখান থেকে।

নৃরী বলে চলেছে– মনিরা আপনার কাছে তুমি আমার পরিচয় গোপন রেখেছো। আমাকে তুমি লুকিয়ে রাখতে চাও তার কাছে? কেন তুমি আমার পরিচয় জানাতে চাওনা কেন তুমি জাভেদকে তার কাছে আত্নীয় বলে পরিচয় দিয়েছো? জবাব দাও, নাহলে আমি তোমাকে কঠিন শাস্তি দেবো। জবাব দাও, কেন তুমি আমার পরিচয় দাওনি এতদিন মনিরা আপার কাছে কনে তুমি জাভেদকে আত্নীয় বলে পরিচয় দিলে? বলল, কেন মিথ্যা কথা বললে তুমি?

বনহুর বললো–নূরী, তুমি বিশ্বাস করো আমি বহুবার বলতে চেয়েছি কিন্তু সে কোনো কথাই আমার শোনেনা বা শুনতে চায় না।

তাই বলে তুমি……দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে নূরী।

বনহুর নূরীকে টেনে নেয় কাছে, চিবুকটা তুলে ধরে বলে–লক্ষীটি শোন তুমি মিছামিছি আমার উপর অভিমান করছো। শোন……

ঠিক ঐ মুহূর্তে দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়ায় মনিরা।

চমকে মুখ তোলে বনহুর।

একখন্ড কালো মেঘ ছড়িয়ে পড়ে মনিরার সারা মুখে।

[পরবর্তী বই নররাক্ষস ও দস্যু বনহুর]

পূর্ববর্তী:

« ৬.১০ গর্জিলা ও দস্যু বনহুর

পরবর্তী:

৬.১২ নররাক্ষস ও দস্যু বনহুর »